পঠন সেতু

সপ্তম শ্রেণি

পরিবেশ
ও
বিজ্ঞান

পরিবেশ
ও
ইতিহাস

পরিবেশ
ও
ভূগোল

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ । পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন । পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ । বিশেষজ্ঞ কমিটি ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঠন সেতু

পরিবেশ ও বিজ্ঞান
পরিবেশ ও ইতিহাস
পরিবেশ ও ভূগোল

সপ্তম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মুখবন্ধ

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিষয়ের ব্রিজ মেটিরিয়াল 'পঠন সেতু' প্রকাশিত হল। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে - এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ ও সেতু নির্মাণের পাশাপাশি পরিচিতি ও শিখনের মানোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নেবেন এবং 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা ক্রিয়াশীল রাখবেন - এই প্রত্যাশা রাখি। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০২১
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের জন্য 'ব্রিজ মেটিরিয়াল' প্রস্তুত করা হয়েছে। এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে — এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিগত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের শ্রেণি-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিখন সামর্থ্যের সংযোগ ও সেতু নির্মাণ।

শিক্ষিকা/শিক্ষকদের কাছে আমাদের আবেদন, 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি প্রয়োজনীয় কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ার কারণে, এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারবেন। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০২১
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঠন সেতু

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় নির্মাণ, সম্পাদনা ও বিন্যাস

রাজীব কুমার কর ড. ধীমান বসু îo˜#œ ö‡yi

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	তাপ	1
2.	আলো	5
3.	পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া	12
	নমুনা প্রশ্নপত্র ১	23
4.	পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা	25
5.	মানুষের খাদ্য	34
6.	উদ্ভিদের দেহের গঠনগত বৈচিত্র্য	43
	নমুনা প্রশ্নপত্র ২	55

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 তাপ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- একই উষ্ণতার পাঠ ভিন্ন ভিন্ন থার্মোমিটার স্কেলে কত হবে সেই সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
- কোনো পদার্থ কর্তৃক গৃহীত বা বর্জিত তাপ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা আলোচনা করতে পারবে।
- লীন তাপের ধারণার মাধ্যমে পরিবেশে সংঘটিত নানান অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ঠান্ডা ও গরমের ধারণা

কোনো বস্তু কতটা ঠান্ডা বা কতটা গরম তা যে যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় থার্মোমিটার। তোমরা দৈনন্দিন ঘটনা থেকে দেখেছো দুধকে যখন গরম করা হয় তখন তার আয়তন বাড়ে এবং দুধ উথলে পড়ে যায়। আবার ঠান্ডা করলে আয়তনে কমে যায়। তাপ প্রয়োগের ফলে প্রায় সমস্ত বস্তুর আয়তন বাড়ে (ব্যতিক্রম হলো 0° থেকে 4°C উষ্ণতার মধ্যে জলের আচরণ)। তাপ প্রয়োগে পারদের প্রসারণের ধর্মকে কাজে লাগিয়ে সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। তোমরা বাড়িতে জ্বর মাপার জন্য থার্মোমিটার দেখেছ।

থার্মোমিটারে একটি কুণ্ডের মধ্যে পারদ রাখা হয়। কুণ্ডের সঙ্গে একটি সরু নল (কৈশিক নল) থাকে। সেখান দিয়ে পারদ আয়তন বৃদ্ধির সময় ওঠে এবং আয়তন হ্রাসের সময় নামে। একই রকম থার্মোমিটারকে গলিত বরফে রাখলে পারদ স্তম্ভ যেখানে থাকে সেলসিয়াস থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে তাকে 0°C এবং ফারেনহাইট থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে 32°F লেখা হয়। ঐ দুই থার্মোমিটারের কুণ্ডকে ফুটন্ত জলের বাষ্পের উপর রাখা হলে পারদস্তম্ভ যেখানে থাকে সেলসিয়াস থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে তাকে 100°C এবং ফারেনহাইট থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে তাকে 212°F লেখা হয়।

সেলসিয়াস থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী অঞ্চলকে 100টি সমানভাবে ভাগ করলে পরপর দুটি দাগের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য 1°C বোঝায়। একইভাবে ফারেনহাইট থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী অঞ্চলকে 180টি সমান ভাগ করে দুটি পরপর দাগের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য 1°F বোঝানো হয়।

রেখা দিয়ে বোঝানো সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট থার্মোমিটারের স্কেলের ছবি পাশে দেওয়া হলো। ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে C ও ফারেনহাইট স্কেলে F দেখাচ্ছে। সেলসিয়াস স্কেলে 0° থেকে C-এর দূরত্ব এবং ফারেনহাইট স্কেলে 32° থেকে F-এর দূরত্ব সমান। একইভাবে সেলসিয়াস স্কেলে 0° থেকে 100°-এর দূরত্ব এবং ফারেনহাইট স্কেলে 32° থেকে 212°-এর দূরত্ব সমান। তাই লেখা যায়

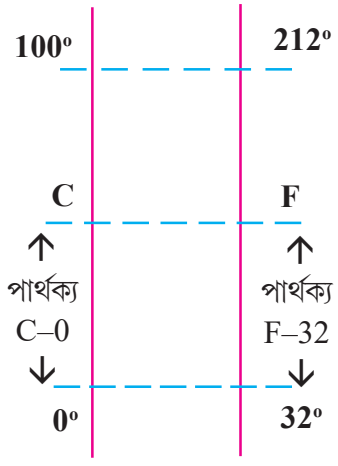

$$\frac{C-0}{100-0}=\frac{F-32}{212-32} \quad \text{বা,} \quad \frac{C}{100}=\frac{F-32}{180} \quad \text{বা,} \quad \frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$$

- এবার – 40°C কত ডিগ্রি ফারেনহাইটের সমান তা নির্ণয় করো।

উষ্ণতার পরিবর্তন ও তাপের ধারণা

শীতকালে ঠান্ডা জলের সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে আমরা অনেকেই স্নান করি যে জলের তাপমাত্রা ঠান্ডা জলের চেয়ে বেশি কিন্তু গরম জলের চেয়ে কম। এর থেকে বোঝা গেল দুটি আলাদা উষ্ণতার বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে একটির উষ্ণতা বাড়ে ও অন্যটির উষ্ণতা কমে। যে বস্তুটির উষ্ণতা বাড়ল ভাবা যেতে পারে যে সে বাড়তি কিছু পেল। একইভাবে যার উষ্ণতা কমল সে কিছু হারাল। দুটি ভিন্ন উষ্ণতার বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে যা হারায় বা যা বাড়তি পায় তাকেই আমরা বলি তাপ। প্রকৃতপক্ষে দুটি ভিন্ন উষ্ণতার বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে বেশি উষ্ণতার বস্তুটি থেকে কিছু পরিমাণ শক্তি কম উষ্ণতার বস্তুটিতে চলে যায়। এই বিনিময় ঘটা শক্তিকেই তাপ বলা হয়। তাই তাপ কিন্তু কোনো বস্তু নয়, তাপ হলো শক্তি। কোনো পদার্থের যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে (অর্থাৎ যখন পদার্থটি কঠিন থেকে তরল হয়, বা তরল থেকে বাষ্প হয়, বা বাষ্প থেকে তরল হয় ইত্যাদি) তখন তাপ গ্রহণ বা বর্জন করা সত্ত্বেও ওই পদার্থটির উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না। এই তাপকে অবস্থান্তরের লীন তাপ বলা হয়।

গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাপ

কোনো পাত্রে কিছু পরিমাণ জল নিয়ে গরম করতে থাকলে দেখা যাবে ধীরে ধীরে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটছে। যত বেশি তাপ প্রয়োগ করা হবে তত বেশি তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটবে। কোনো বস্তু থেকে তাপ নিষ্কাশন করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে : যত বেশি তাপ নিষ্কাশিত হয় উষ্ণতা তত হ্রাস পায়।

নির্দিষ্ট ভরের কোনো বস্তু বাইরে থেকে কতটা তাপ নিয়েছে বা কতটা তাপ ওই বস্তু থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে সেটা নির্ভর করে ওই বস্তুর উষ্ণতা আগের থেকে কতটা বাড়ল বা কমল তার উপর। উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয়, তবে বস্তুর নেওয়া তাপের পরিমাণও দ্বিগুণ হবে। বস্তু বাইরে থেকে যতটা তাপ নেয় বা যতটা তাপ ছেড়ে দেয় তার সঙ্গে বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা উষ্ণতা হ্রাসের সরল সম্পর্ক রয়েছে।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে উষ্ণতা একই পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এক বাটি জলের ক্ষেত্রে যত তাপ লাগে, এক বালতি জলের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি তাপ লাগে। তাই বলা যায় যে উপাদান একই থাকলে সম পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে বেশি ভরের বস্তুর বেশি তাপ দরকার।

উষ্ণতা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়া বা কমার জন্য কোনো বস্তু কতটা তাপ বাইরে থেকে নেবে বা হারাবে সেটা ওই বস্তুটির ভরের সঙ্গে সরল সম্পর্কে থাকে। একইভাবে যদি একই পরিমাণ জল ও দুধ দুটি একইরকম পাত্রে নেওয়া হয় তবে একই পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করলে দুধের উষ্ণতা বৃদ্ধি জলের চেয়ে বেশি হবে। এ থেকে বলা যেতে পারে যে উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য একটি বস্তু কতটা তাপ গ্রহণ বা বর্জন করবে তা বস্তুটি কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি তার উপর নির্ভর করে।

গৃহীত বা বর্জিত তাপ পরিমাপ করার জন্য SI পদ্ধতিতে যে একক ব্যবহার করা হয় তা হলো জুল। CGS পদ্ধতিতে তাপের একক ক্যালোরি।

যে কোনো পদার্থই তার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বদলে যাওয়ার সময়ে কিছু লীন তাপ সংগ্রহ করে অথবা হারায়। কিন্তু এই তাপ ওই পদার্থের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। $0^{o}C$ উষ্ণতার 1 গ্রাম বিশুদ্ধ বরফ $0^{o}C$ তাপমাত্রায় 1 গ্রাম জলে পরিণত হওয়ার জন্য 80 ক্যালোরি তাপ গ্রহণ করে। একই ভাবে $100^{o}C$-এ 1 গ্রাম বিশুদ্ধ জল $100^{o}C$ তাপমাত্রায় 1 গ্রাম বাষ্পে পরিণত হতে 537 ক্যালোরি তাপ প্রয়োজন।

এবার জেনে নেওয়া যাক, পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন কত রকমের হয়। নীচের তালিকাটা ভালো করে লক্ষ করো:

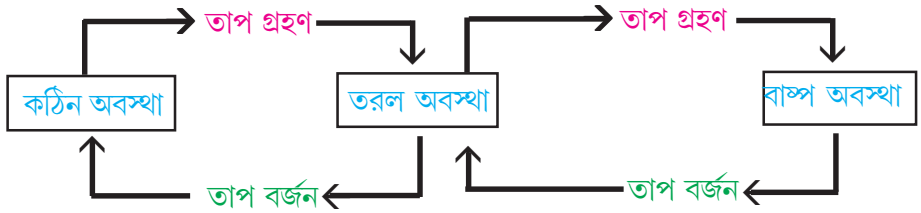

এবার নীচের সারণিটা পূরণ করো—

পদার্থ কোন অবস্থা থেকে কোন অবস্থায় বদলাচ্ছে	অবস্থার পরিবর্তনের নাম	লীন তাপ গ্রহণ/বর্জন	লীনতাপের নাম
কঠিন থেকে তরল	গলন		গলনের লীন তাপ
তরল থেকে কঠিন	কঠিনীভবন	বর্জন	
তরল থেকে বাষ্প	বাষ্পীভবন	গ্রহণ	
বাষ্প থেকে তরল	ঘনীভবন		

একক ভরের কোনো পদার্থের উষ্ণতার পরিবর্তন না ঘটিয়ে যদি শুধু অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তখন ওই পদার্থ বাইরে থেকে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে, সেই পরিমাণ তাপকেই ওই পদার্থের ওই অবস্থা পরিবর্তনের লীন তাপ বলে।

'ক' এবং 'খ' তালিকা দুটো ভালোভাবে লক্ষ করো। জল তার বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বাইরে থেকে কতটা লীন তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে তা এই তালিকা থেকে জানতে পারবে।

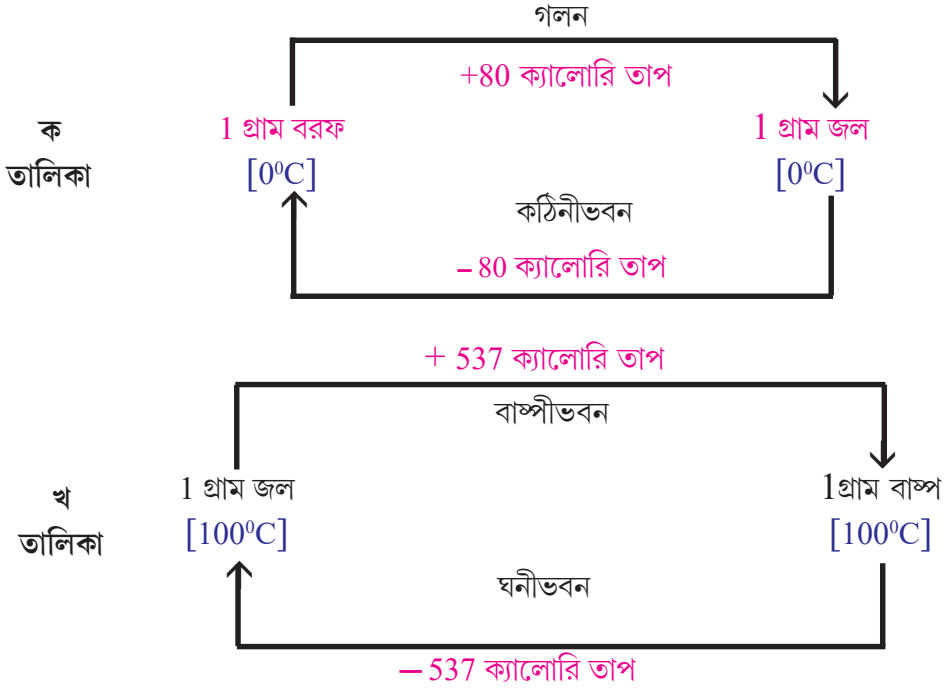

হাতে স্পিরিট বা ইথার ঢাললে ওই জায়গাটায় ঠান্ডা অনুভূত হয়। আসলে, স্পিরিট বা ইথার উদ্‌বায়ী পদার্থ (এই ধরনের পদার্থের খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভবন হয়)। বাষ্পীভবনের জন্য দরকার লীন তাপ। স্পিরিট ওই লীন তাপ কোথা থেকে নেবে? স্পিরিট তখন আশপাশের পরিবেশ ও হাত থেকেই সেই লীন তাপ সংগ্রহ করে। ফলে হাতের ওই অংশ তখন তাপ হারায়। তখন পাশাপাশি অঞ্চলের তুলনায় ওই অংশের উষ্ণতা কমে যায়। ফলে ওই অংশে ঠান্ডার অনুভূতি হয়।

মাটির কলশির জল ঠান্ডা থাকে। আসলে, মাটির কলশির গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। ওই ছিদ্রগুলো দিয়ে সামান্য পরিমাণ জল কলশির বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন তার বাষ্পীভবন ঘটে। ফলে দরকার হয় লীন তাপের। ওই বেরিয়ে আসা জল তখন কলশি এবং কলশির ভেতরে থাকা জল থেকে প্রয়োজনীয় লীন তাপ সংগ্রহ করে। ফলে কলশি ও কলশির জল তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে পড়ে।

এখন দেখো তো তুমি নীচের ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারো কিনা।

- স্নান করে ওঠার পর পাখা চালিয়ে তার নীচে দাঁড়ালে ঠান্ডা বোধ হয়।
- জল দিয়ে ঘর মোছার পর মেঝে ঠান্ডা হয়।
- গরমকালে ঘরের জানালা-দরজা খোলা রেখে ভেজা পরদা টাঙানো হলে ঘর বেশ ঠান্ডা থাকে।

মনে রাখা জরুরি :

- তাপ কিন্তু কোনো বস্তু নয়, তাপ হলো শক্তি।
- কোনো পদার্থের যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে (অর্থাৎ যখন পদার্থটি কঠিন থেকে তরল হয়, বা তরল থেকে বাষ্প হয়, বা বাষ্প থেকে তরল হয় ইত্যাদি) তখন তাপ গ্রহণ বা বর্জন করা সত্ত্বেও ওই পদার্থটির উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না। এই তাপকে অবস্থান্তরের লীন তাপ বলা হয়।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে সপ্তম শ্রেণির 'তাপ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ কঠিনের তরলে পরিবর্তিত হওয়াকে বলা হয়— (ক) গলন (খ) বাষ্পীভবন (গ) উর্ধ্বপাতন (ঘ) ঘনীভবন

১.২ বরফ গলনের লীন তাপ 80 cal/গ্রাম কথার অর্থ হলো — (ক) 1 গ্রাম বরফ গলে সম উষ্ণতার 1 গ্রাম জলে পরিণত হতে হলে পরিবেশ থেকে 80 cal তাপ গ্রহণ করবে। (খ) 1 গ্রাম বরফ গলে সম উষ্ণতার 1 গ্রাম জলে পরিণত হতে হলে পরিবেশে 80 cal তাপ বর্জন করবে। (গ) 1 গ্রাম বরফ থেকে 25°C উষ্ণতার 1 গ্রাম জল পেতে হলে বরফে 80 cal তাপ দিতে হবে। (ঘ) 1 গ্রাম বরফ থেকে 25°C উষ্ণতার 1 গ্রাম জল পেতে হলে বরফ থেকে 80 cal তাপ নিষ্কাশন করতে হবে।

২. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

২.১ হাতে স্পিরিট ঢাললে হাতে ঠান্ডা লাগে কারণ স্পিরিট হাতকে বাষ্পীভবনের লীনতাপ দিয়ে দেয়।

২.২ সমান ভরের জল ও দুধের উষ্ণতা সমান পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হলে সমান পরিমাণে তাপ লাগবে।

৩. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ হাতে স্পিরিট ঢাললে ঠান্ডা লাগে কেন?

৩.২ দুটি বস্তুর মধ্যে তাপের আদান-প্রদান হওয়া মধ্যেও উষ্ণতা বৃদ্ধি হচ্ছে না এমন হতে পারে কি? উদাহরণ দাও।

2 আলো

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- স্বপ্রভ বস্তু, অপ্রভ বস্তু, বিন্দু আলোক উৎস, বিস্তৃত আলোক উৎস, স্বচ্ছ বস্তু বা মাধ্যম, অস্বচ্ছ বস্তু বা মাধ্যম, ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তু বা মাধ্যম চিহ্নিত করতে ও তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
- সাধারণ পরীক্ষার সাহায্যে আলোর সরলরৈখিক গতির প্রদর্শন করতে পারবে।
- প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
- চিত্রসহ আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের প্রাথমিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা আলো ছাড়া কোনো বস্তুকে দেখতে পাই না। তাই রাতের বেলায় ঘরের ভিতর আলো ছাড়া কোনো বস্তুকে দেখতে পাই না। যাদের নিজস্ব আলো আছে সেই বস্তুগুলো থেকে নিজস্ব আলো নির্গত হয়। এই বস্তুগুলোকে স্বপ্রভ বস্তু বা আলোক উৎস বলে যেমন—সূর্য, তারা, জোনাকি ইত্যাদি। আবার যে বস্তুগুলোর নিজস্ব আলো নেই সেই বস্তুগুলোকে অপ্রভ বস্তু বলে। যেমন চেয়ার, টেবিল, ইট, কাঠ, পাথর ইত্যাদি। আলোক উৎস যদি খুব ছোটো হয় তখন তাকে বিন্দু উৎস বলে। বিন্দু আলোক উৎসের চেয়ে আকারে বড়ো আলোক উৎসকে বিস্তৃত আলোক উৎস বলে। যেমন—সূর্য, বৈদ্যুতিক বালব ইত্যাদি।

যে সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়ে আলো সহজে যাতায়াত করতে পারে তাদের স্বচ্ছ বস্তু বা স্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন—কাচ, বায়ু ইত্যাদি। যে সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়ে আলো যাতায়াত করতে পারে না তাদের অস্বচ্ছ বস্তু বা অস্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন—ইট, কাঠ, পাথর ইত্যাদি। যে সমস্ত বস্তু বা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণ আলো যাতায়াত করে সেই সমস্ত বস্তু বা মাধ্যমকে বলে ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তু বা ঈষৎ স্বচ্ছ মাধ্যম। যেমন—ঘষা কাচ, কুয়াশা, ট্রেসিং পেপার ইত্যাদি।

কোনো মাধ্যম ছাড়াই আলো চলাচল করতে পারে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এক বিরাট অংশে কোনো মাধ্যম না থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছায়। একটি সোজা ও একটি বাঁকা নলের সাহায্যে মোমবাতির শিখাকে দেখলে প্রথম ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যাবে না। এর থেকে আমরা বলতে পারি আলো সরলরেখায় যাতায়াত করে।

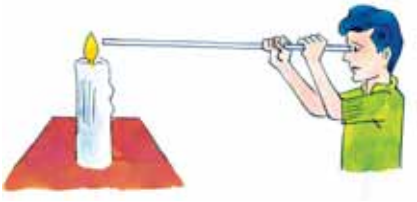

আলোর আচার-আচরণকে বুঝতে আমরা জ্যামিতির চিত্রের সাহায্য নিই। আলোর চলার পথকে তির চিহ্ন যুক্ত যে কাল্পনিক সরলরেখা দিয়ে বোঝানো হয় তাকে 'আলোকরশ্মি' (Ray of light) বলে। একটি আলোকরশ্মি বলে বাস্তবে কিছু নেই। একসঙ্গে অসংখ্য আলোকরশ্মিকে আলোকরশ্মিগুচ্ছ (Beam of light) বলে। আলোকরশ্মিগুচ্ছ তিন ধরনের হয়।

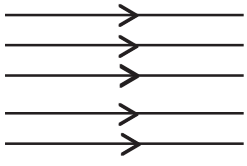

সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুচ্ছ

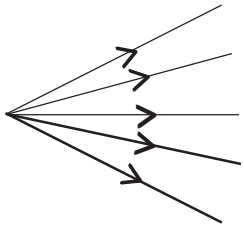

অপসারী আলোকরশ্মিগুচ্ছ

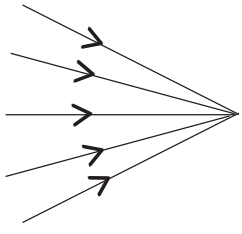

অভিসারী আলোকরশ্মিগুচ্ছ

রাত্রে যদি তোমার ঘরে অবস্থিত কোনো একটি আলোক উৎসের (টিউব বা বালব) বিপরীত দিকের দেওয়ালের কাছাকাছি হাতের তালু রাখো তাহলে দেওয়ালের উপর হাতের তালুর আকৃতির একটা অন্ধকার জায়গা গঠিত হয়। দেখবে মাঝখানের অন্ধকার আকৃতির অংশটি বেশ গাঢ়, আর ওই গাঢ় অন্ধকার অংশকে ঘিরে রয়েছে একটা আবছা অন্ধকার অংশ।

ওই **গাঢ় অন্ধকার** অংশটি হল **প্রচ্ছায়া**। আর প্রচ্ছায়া ঘিরে থাকা **আবছা অন্ধকার** অংশটি হল **উপচ্ছায়া**।

তুমি হাতটা যত দেওয়ালের কাছে নিয়ে যাবে প্রচ্ছায়া তত ছোটো হবে আর উপচ্ছায়াও তত কমবে। যখন হাত দেওয়ালের খুব কাছে তখন উপচ্ছায়া প্রায় নেই, শুধুই প্রচ্ছায়া।

হাতটি দেওয়াল থেকে দূরে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে প্রচ্ছায়া অংশ ক্রমেই ছোটো হচ্ছে আর উপচ্ছায়া ক্রমেই বড়ো হচ্ছে। যদি উৎস ছোটো অর্থাৎ বিন্দু উৎস হয় তখন উপচ্ছায়া গঠিত হয় না, শুধুই প্রচ্ছায়া গঠিত হয়। বিন্দু উৎস তৈরি করা হয় একটি কালো পিচবোর্ডের মাঝে পেরেক দিয়ে ফুটো করে একটি আলোক উৎস ওই ফুটোর কাছাকাছি রাখলে।

আলো সরলরেখায় গমন করে বলেই বস্তুর প্রচ্ছায়া গঠিত হয়। বিস্তৃত আলোক উৎসের ক্ষেত্রে গঠিত হয় উপচ্ছায়া। এক্ষেত্রেও আলোর সরলরৈখিক গতিই দায়ী। নীচের ছবিগুলি দেখো।

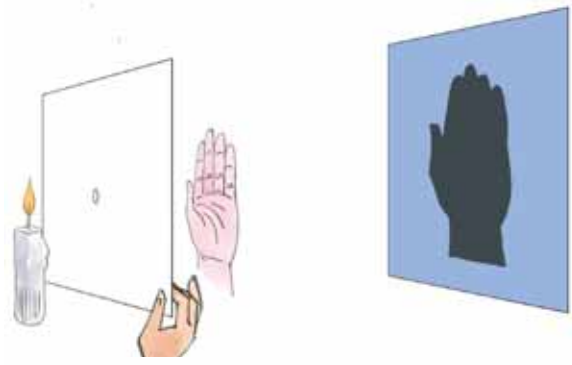

সূচিছিদ্র ক্যামেরা

ঘরের দেওয়ালের কাছে একটি টেবিলের উপর একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখা হলো এবং এর সামনে একটা কার্ডবোর্ড নিয়ে একটি পেরেকের সাহায্যে মাঝখানে একটা ছিদ্র (P) করা হল। ঘর অন্ধকার করে মোমবাতির শিখা (BA) ও দেওয়ালের মধ্যে কার্ডবোর্ডটিকে ধরা হলো। মোমবাতির শিখা ও কার্ডবোর্ডের ছিদ্রকে একই সরলরেখায় রাখা হলো। এখন দেওয়ালে মোমবাতির শিখার একটি উলটানো ছবি (A′ B′) গঠিত হয়েছে। আলো সরলরেখায় চলাচল করে বলেই এই ঘটনা ঘটেছে।

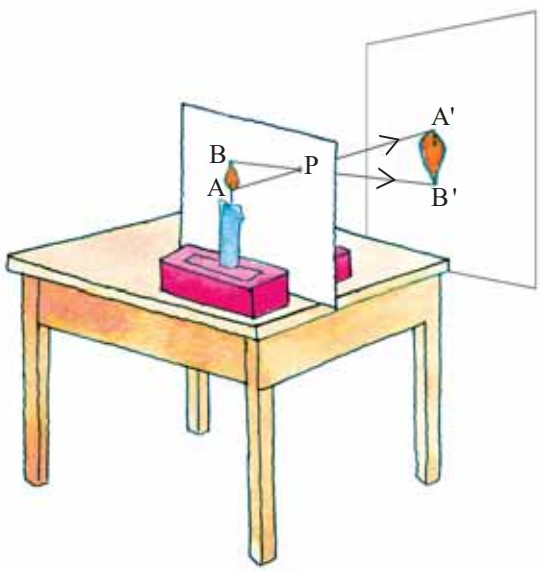

কার্ডবোর্ড থেকে মোমবাতির দূরত্ব যত বৃদ্ধি পাবে মোমবাতির শিখার প্রতিকৃতি তত ছোটো হবে।

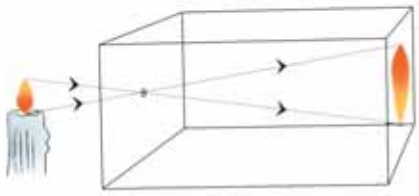

উৎস ছিদ্রের কাছে

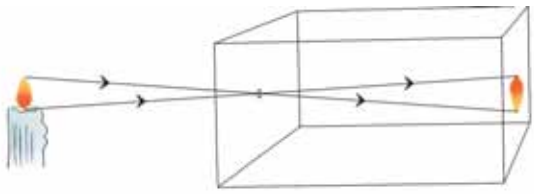

উৎস ছিদ্র থেকে দূরে, বাক্সের দৈর্ঘ্য একই আছে

একইভাবে শিখা ও ছিদ্রের দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে ছিদ্র থেকে পর্দার দূরত্ব (অর্থাৎ ক্যামেরার দৈর্ঘ্য) যত বাড়ানো হবে প্রতিকৃতিও তত বড়ো হবে। বিপরীত ক্রমে ছিদ্র ও পর্দার মধ্যে দূরত্ব কমলে প্রতিকৃতি ছোটো হয়ে যাবে।

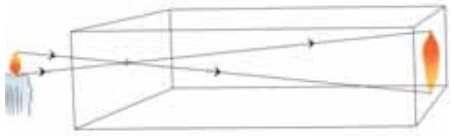

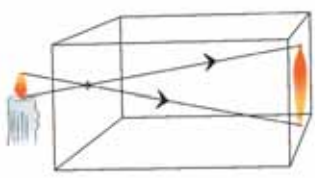

যদি কার্ডবোর্ডের ছিদ্র বড়ো হয় তবে মোমবাতি শিখার একটি অস্পষ্ট প্রতিকৃতি তৈরি হয়। ছিদ্র বড়ো হলে তা অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্রের সমষ্টিরূপে কাজ করে। তাই প্রতিটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে আলাদা আলাদা স্পষ্ট প্রতিকৃতি তৈরি হয়, যা মিলেমিশে একটা অস্পষ্ট প্রতিকৃতি তৈরি করে।

স্বাভাবিকভাবেই ছিদ্র যত ছোটো হবে প্রতিকৃতি তত সূক্ষ্ম হবে। সূচিছিদ্র ক্যামেরায় বস্তুর প্রতিকৃতি গঠিত হয় মাত্র, তা মোটেই প্রতিবিম্ব নয়।

আলোর প্রতিফলন

আলো যখন কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাবার পর অন্য কোনো মাধ্যমের উপরিতলে আপতিত হয়, তখন আলোর কিছু অংশ দিক পরিবর্তন করে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিফলন।

আলোর প্রতিফলন যে বিভেদতল থেকে হয় তাকে প্রতিফলক বলে। উদাহরণস্বরূপ, আয়নাকে আমরা প্রতিফলক বলতে পারি। যে পথ ধরে আলো প্রতিফলকের উপর এসে পড়ে তাকে আপতিত আলোকরশ্মি (incident ray) বলে। প্রতিফলকের উপর পড়ার পর যে পথে আলো ফিরে যায় তাকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি বলে। যে বিন্দুতে আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের উপর পড়ে তাকে আপতন বিন্দু বলা হয়। আলোর প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে।

(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে এবং প্রতিফলকের উপর লম্ব হয়। (২) আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান হয়।

চিত্রে AB আপতিত রশ্মি, BC প্রতিফলিত রশ্মি, B বিন্দু আপতন বিন্দু, BD আপতন বিন্দুতে অভিলম্ব। প্রতিফলকের অবস্থান XY রেখাংশ দিয়ে বোঝানো হয়। অভিলম্ব ও আপতিত রশ্মির মাঝের কোণকে আপতন কোণ বলে। এখানে $\angle ABD = \angle i$ দ্বারা সূচিত করা হয়। অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মির মাঝের কোণকে প্রতিফলন কোণ বলা হয়, যা $\angle CBD = \angle r$ দ্বারা সূচিত করা হয়।

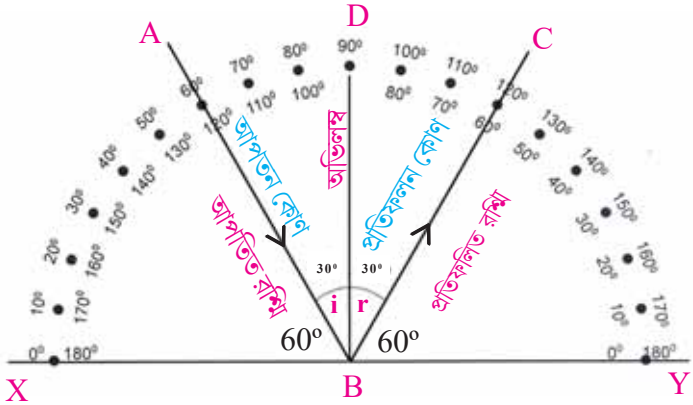

সমতলে দর্পণে নিয়মিত প্রতিফলনের সময় আপতিত আলোর রশ্মিগুচ্ছ একটি বিশেষ ধরনের হলে প্রতিফলনের পরেও সেই রশ্মিগুচ্ছ ওই বিশেষ ধরনেরই হয় যেমন, সমান্তরাল বা অভিসারী বা অপসারী।

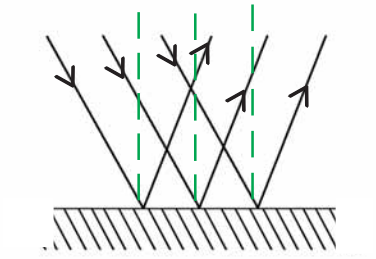

সমতলে দর্পণে নিয়মিত প্রতিফলনের আগে রশ্মিগুচ্ছের সমান্তরাল থাকলে প্রতিফলনের পর রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল হবে।

যখন অমসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন ঘটে তখন সেই প্রতিফলনকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (Diffused Reflection of light) বলে। যেমন — গাছপালা, মাটি, ঘরের দেয়াল, সিনেমার পর্দা ইত্যাদির উপর আলোর প্রতিফলন।

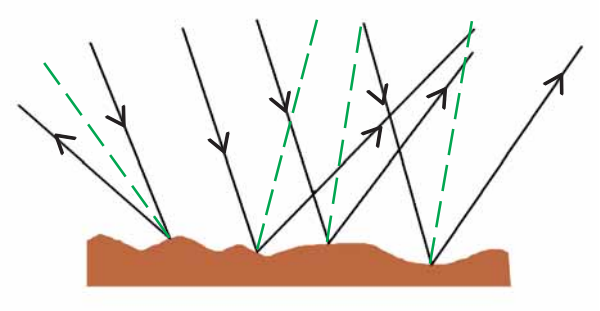

এই প্রতিফলনে আপতিত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল হলেও প্রতিফলনের পর তারা আর সমান্তরাল থাকে না। বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে দুই ক্ষেত্রেই প্রতিটি আলোকরশ্মি প্রতিফলনের দুটি সূত্রই মেনে চলে।

প্রতিবিম্ব

হাতেকলমে

একটা আয়নার সামনে একটু কোণ করে (ছবির মতো) একটা টর্চ ধরো।

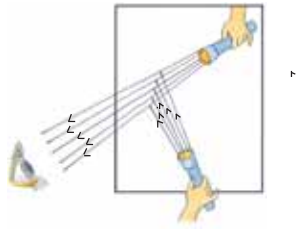

এবার টর্চটা জ্বালাও।

কী দেখলে?

আয়নায় টর্চের আলোর প্রতিফলন ঘটে আলো যে দিকে বেরিয়ে এল, তোমার চোখকে সেদিকে নিয়ে যাও। এবার ওই দিক থেকে আয়নার মধ্যে তাকাও। **কী দেখতে পাচ্ছ?**

তোমার কি মনে হচ্ছে আলোটা আয়নার ভিতরে থাকা একটা টর্চ থেকে আসছে?

সত্যিই কি আলো আয়নার ভিতরে থাকা টর্চ থেকে আসছে?

সত্যিই কি আয়নার ভিতরে কোনো টর্চ আছে?

আয়নার ভিতরে যে টর্চটা তুমি দেখেছ, সেটা আসলে তোমার হাতে থাকা (আয়নার বাইরে) টর্চটার প্রতিবিম্ব। এই ঘটনাটা ঘটেছে আলোর প্রতিফলন ধর্মের জন্য।

যে-কোনো চকচকে তলের উপর বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মির প্রতিফলনের ফলে এমনই প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। বস্তুটি চকচকে তলটির যে দিকে থাকে, বস্তুর প্রতিবিম্ব ঠিক তার উলটোদিকে তৈরি হয়।

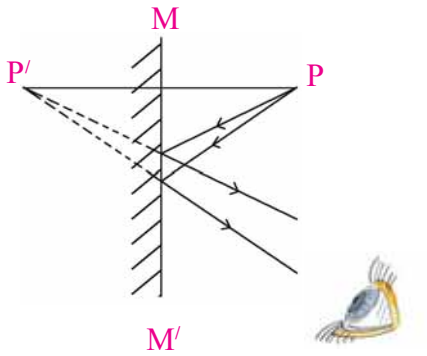

আলোকরশ্মির চিত্র এঁকে প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়।

P - বস্তু, P/ -প্রতিবিম্ব, MM/- আয়না।

যে -কোনো চকচকে তল — সানগ্লাসের কাচ, চকচকে পালিশ করা টেবিল, পুকুরের জল, জানালার গাঢ় রঙের চকচকে কাচ ইত্যাদির মধ্যে এমন প্রতিবিম্ব গঠিত হওয়া সম্ভব।

হাতেকলমে

তুমি একটা বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়াও। আয়নায় গঠিত হওয়া তোমার প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ করো। **তোমার আর তোমার প্রতিবিম্বের উচ্চতা কি এক?**

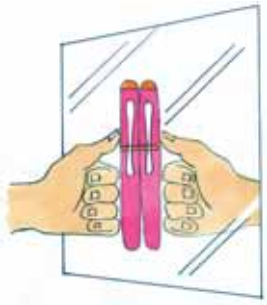

এবার একটা পেন হাতে নিয়ে আয়নাটার উপর শুইয়ে দিয়ে, আঙুল দিয়ে চেপে ধরো।

এবার দেখত তোমার আঙুলে চাপা পেন (আয়নার বাইরে) আর আয়নারভিতরকার পেনের প্রতিবিম্ব একেবারে সমান মাপের কিনা?

আয়নায় গঠিত **'প্রতিবিম্ব'**ও **'বস্তুর' মাপ** (Size) সমান।

এবার একটি আয়না থেকে তুমি ঠিক মেপে মেপে 'চার পা' পিছিয়ে এসে দাঁড়াও।

এবার এক পা এক পা করে আয়নার দিকে এগোতে থাকো, আর তোমার প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ রাখো।

প্রতিবিম্বও কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে এক পা এক পা করেই তোমার দিকে এগোচ্ছে?

তুমি আয়না পর্যন্ত পৌঁছোতে যত দূরত্ব অতিক্রম করলে তোমার প্রতিবিম্বও কী আয়না পর্যন্ত পৌঁছোতে তত দূরত্বই অতিক্রম করল ?

তাহলে বলা যায়, **'বস্তু থেকে আয়না ও আয়না থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান'**।

তোমার ডান হাতটা দিয়ে আয়নাটাকে স্পর্শ করো।

—প্রতিবিম্ব কোন হাত দিয়ে আয়নাটাকে স্পর্শ করল?

তোমার বাঁ পা-টা একটু ওঠাও।

তোমার প্রতিবিম্বের কোন পা উঠল?

তবে বলা যায় **আয়নায় বস্তুর প্রতিবিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন হয়**। অর্থাৎ ডান দিকটা বাঁ দিক ও বাঁ দিকটা ডান দিক মনে হয়। কিন্তু উপরটা উপর দিকে এবং নীচেরটা নীচের দিকেই থাকে। অর্থাৎ আয়নায় গঠিত **প্রতিবিম্ব সমশীর্ষ**।

আলোর প্রতিসরণ

দুটি মাধ্যমের বিভেদতলের মধ্য দিয়ে আলো যদি বিভেদতলের সঙ্গে আনতভাবে একমাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে প্রবেশ করে, তবে ওই বিভেদতলে আলোকরশ্মির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

যখন দুটি আলাদা ঘনত্বের মাধ্যমের সংযোগস্থলে যে তল থাকে তাকেই ওই মাধ্যমদুটির বিভেদতল বলে।

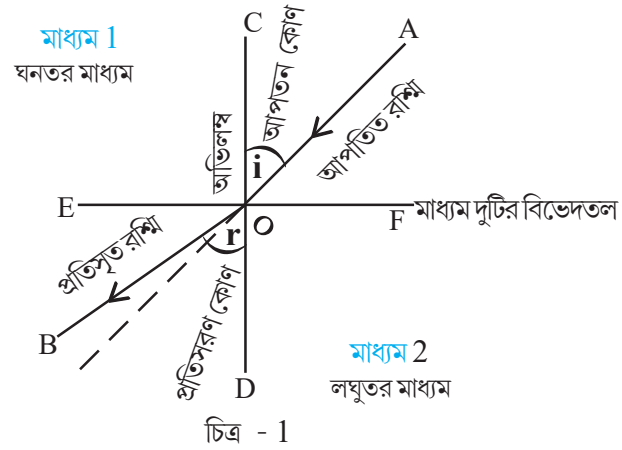

চিত্র - 1

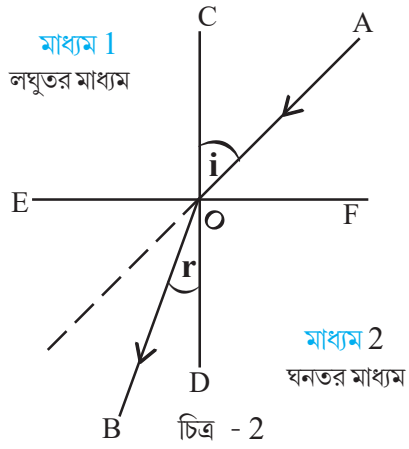

চিত্র - 2

উভয়চিত্রে AO হলো আপতিত রশ্মি এবং OB হলো প্রতিসৃত রশ্মি। এবং CD, O বিন্দুতে প্রতিসারকের উপর লম্ব। লঘুতর মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘনতর মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায়।

হাতেকলমে

একটা কাচের গ্লাসের মধ্যে একটা পেন বা সোজা কাঠি রাখো।

এবার গ্লাসটাতে কিছুটা জল ঢালো। পেন বা কাঠিটার কোনো অংশে কি কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছ?

পরিবর্তন হলে সেটা কোন অংশে?

পেন বা কাঠিটার নীচের অংশ যেখান থেকে জলের ভেতরে আছে সেখান থেকে পেন বা কাঠিটাকে বাঁকা লাগছে কেন?

পেন বা কাঠিটাকে জল থেকে তুলে দেখো তো পেন বা কাঠিটা সত্যিই বেঁকেছে কিনা?

আসলে গ্লাসে জল ভরার পরই যেহেতু ঘটনাটা ঘটেছে, আবার জল থেকে পেন বা কাঠি তুলে নিলে পেন বা কাঠিটা যেহেতু সোজাই থাকে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গ্লাসে জল ঢালাই এর কারণ।

আসলে গ্লাসে জল ঢালার পর গ্লাসের ভিতরে দুটো মাধ্যম থাকে। **(1) জল (ঘনতর মাধ্যম) ও (2) বায়ু (লঘুতর মাধ্যম)।**

পেন বা কাঠির জলের তলার অংশ থেকে আলো যখন জল (ঘনতর মাধ্যম) পেরিয়ে বায়ুতে (লঘুতর মাধ্যম) পৌঁছোয় তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতল থেকে আলো বেঁকে গিয়ে তোমার চোখে এসে পড়ে। তোমার চোখ তখন আসল পেন বা কাঠিটার নিমজ্জিত অংশ নয়, পেন বা কাঠির নিমজ্জিত অংশের প্রতিবিম্বটি দেখো। প্রতিসরণের জন্যও প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

মনে রাখা জরুরি :

- সূচিছিদ্র ক্যামেরার ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি তৈরি হয় প্রতিবিম্ব নয়।
- নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রতিফলনে ক্ষেত্রে আপতন বিন্দুতে প্রতিফলনের দুটি সূত্র মেনে চলে।
- নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি যায় কিন্তু অনিয়মিত ক্ষেত্রে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে সপ্তম শ্রেণির 'আলো' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ নীচের যেটি স্বপ্রভ বস্তু সেটি হলো — ক) পেনসিল খ) চাঁদ গ) জ্বলন্ত বাল্ব ঘ) কাগজ

১.২ যেটি ঈষৎ স্বচ্ছ মাধ্যম সেটি হলো — ক) ঘষা কাচ খ) কাচ গ) জল ঘ) রঙিন কাচ

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ ঘষা কাচ _____ মাধ্যমের উদাহরণ।

২.২ অপ্রভ বস্তুর একটি উদাহরণ হলো _____।

২.৩ প্রচ্ছায়ার চেয়ে উপচ্ছায়া অঞ্চলে আলোর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে _____।

২.৪ সূচিছিদ্র ক্যামেরায় বস্তুর উল্টো _____ গঠিত হয়।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ আলো চলাচলে কোনো মাধ্যমের উপস্থিতি অত্যাবশক শর্ত নয়।

৩.২ সূচিছিদ্র ক্যামেরায় বস্তুর উল্টো প্রতিকৃতি গঠিত হয়।

৩.৩ জ্বলন্ত টর্চ আলোর একটি বিন্দু উৎসের উদাহরণ।

৪. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ আলোকরশ্মি বলতে কী বোঝায়?

৪.২ সূর্য থেকে পৃথিবীর মধ্যে বিরাট অংশে কোনো মাধ্যম নেই। তবুও রোজ সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়। এই তথ্য থেকে কী বোঝা যায়?

৪.৩ আলোর উৎস বড়ো না ছোটো কেমন হলে বস্তুর উপচ্ছায়া প্রায় বোঝাই যায় না?

৫. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ প্রতিফলনের প্রথম সূত্রটিতে যা বলা হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৫.২ একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে সূচিছিদ্র ক্যামেরার কাছে রাখা হলো। নীচের কোন ক্ষেত্রে প্রতিকৃতির কী পরিবর্তন হবে লেখো — ক) ক্যামেরার দৈর্ঘ্য ছোটো করা হলো। খ) ছিদ্রকে বড়ো করা হলো। গ) মোমবাতিকে ছিদ্র থেকে দূরে সরানো হলো।

3 পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পরমাণুর গঠনের বর্ণনা দিতে পারবে।
- কীভাবে পরমাণু থেকে আয়ন উৎপন্ন হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।
- আয়নীয় যৌগের উপাদান আয়নের সংকেত ব্যবহার করে যৌগটির সংকেত লিখতে পারবে।
- রাসায়নিক সমীকরণ সমিত করতে পারবে।
- তিন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার (প্রত্যক্ষ সংযোগ, বিয়োজন ও বিনিময়) সমীকরণসহ উদাহরণ দিতে পারবে।

পরমাণু কী দিয়ে তৈরি হয়? গত দুশো বছরে নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পরমাণু সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা গড়ে উঠেছে তা বোঝাতে বিজ্ঞানীরা মডেল বা চিত্র ব্যবহার করেন। আমরাও সেইরকম কিছু চিত্র তোমাদের দেখাব। মনে রেখো কোনোভাবেই সরাসরি দেখে তারপর এই 'চিত্র' আঁকা হয়নি, কারণ পরমাণুকে খালি চোখে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফলাফল থেকে এবং তত্ত্বের সাহায্যে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয়েছে তাকেই মডেল (model) বলা হয়।

তোমার চারপাশের সমস্ত জিনিসই আসলে ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ তাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে। যত পাতলা কাগজই হোক না কেন, একসঙ্গে একশোটা কাগজ পরপর রাখলে মোট উচ্চতা কিন্তু স্কেল দিয়ে মাপা যাবেই। একটা ধুলোর কণারও দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ আছে। তাহলে ভেবে দেখো: **সমস্ত জিনিস যদি প্রাথমিকভাবে পরমাণুর সমষ্টি বলে ভাবা হয়, তাহলে পরমাণুরও তো একটা ত্রিমাত্রিক গঠন থাকতেই হবে,** তাই নয় কি? তা না হলে যত লক্ষ কোটি পরমাণুই জড়ো করো না কেন, সেই সমষ্টির বেধটা আসবে কোথা থেকে? তাহলে বোঝা গেল যে পরমাণু দ্বিমাত্রিক নয়, ত্রিমাত্রিক হতেই হবে। তার আয়তন যতই ক্ষুদ্র হোক, ত্রিমাত্রিকতা অস্বীকার করলে চলবে না। **পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিজ্ঞানীদের তৈরি পরমাণুর মডেল ত্রিমাত্রিক।** কিন্তু বইয়ের পাতার ওপরে ত্রিমাত্রিক জিনিস কি দেখানো যায়? যায়না তো? তাহলে নীচের ছবিগুলো আসলে ত্রিমাত্রিক মডেলেরই দ্বিমাত্রিক রূপ। এই ছবিতে প্রথমে হাইড্রোজেন, তারপর হিলিয়াম আর শেষে লিথিয়ামের পরমাণুর মডেল দেখানো হলো।

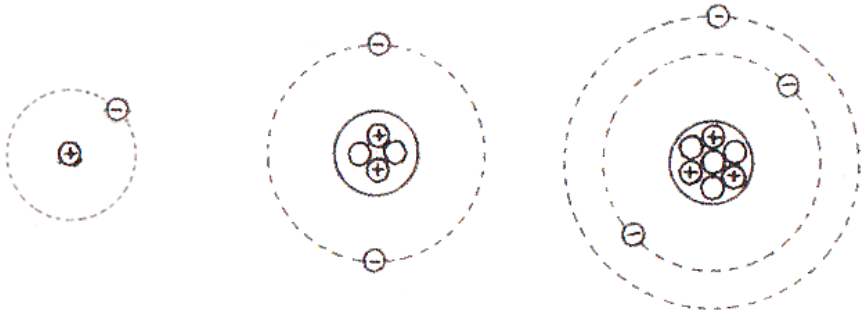

হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম

মনে রেখো আসল পরমাণু কিন্তু মোটেই এত বড়ো নয়, অনেক ছোট্ট, তোমাদের বোঝাবার জন্য বড়ো করে আঁকা হয়েছে। **পরমাণুতে তিন রকমের ক্ষুদ্র কণা থাকে, এদেরও কোনোভাবে দেখা যায়না। এরা হলো প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন।**

একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রনের চার্জ বা আধানের পরিমাণ সমান কিন্তু চার্জের প্রকৃতি পরস্পরের উল্টো — প্রোটনের চার্জ যতটা ধনাত্মক (পজিটিভ), ইলেকট্রনের চার্জ ঠিক ততটাই ঋণাত্মক (নেগেটিভ)। তাই একটা প্রোটনের সঙ্গে একটা ইলেকট্রন থাকলে তার মোট আধান হয় শূন্য, আমরা বলি যে নিস্তড়িৎ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে হাইড্রোজেন পরমাণুতে : ওপরের প্রথম ছবিটা দেখো। সেখানে একটা প্রোটন আর একটাই ইলেকট্রন থাকায় নিস্তড়িৎ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তার

মানে হাইড্রোজেন পরমাণু নিস্তড়িৎ। আমরা বলতে পারি যে সাধারণ অবস্থায় সব মৌলের পরমাণুতেই প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হওয়ার জন্যই মৌলের পরমাণু নিস্তড়িৎ। প্রোটনরা সমধর্মী আধানযুক্ত (সব প্রোটনের আধান ধনাত্মক), তাই তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। আবার ইলেকট্রনরাও সমধর্মী আধানযুক্ত (সব ইলেকট্রনেরই আধান ঋণাত্মক) তাই তারাও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ইলেকট্রন আর প্রোটনের আধান বিপরীত প্রকৃতির, তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে পরমাণুর মাঝখানে খুব অল্প জায়গায় পরমাণুর প্রোটন আর নিউট্রনগুলো একসঙ্গে থাকে। এই জায়গাটাকে বলে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রোটন থাকে কী করে? তাদের মধ্যে তো বিকর্ষণ বল কাজ করার কথা? এখানে প্রোটনগুলো একত্রে থাকতে পারে কারণ 'নিউক্লিয় বল' নামে একরকমে শক্তিশালী আকর্ষণ বল আছে যা বিকর্ষণ বল অপেক্ষা অনেক জোরালো।

পরমাণুতে থাকা ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনের ভর যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তা পরিমাপযোগ্য। সূক্ষ্ম পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা তার হিসেবও করেছেন। পরীক্ষায় জানা গেছে যে একটা প্রোটন আর নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। একটা ইলেকট্রনের ভর কিন্তু একটা প্রোটনের ভরের প্রায় 1800 ভাগের একভাগ মাত্র। তাহলে কোনো পরমাণুর প্রোটন আর নিউট্রনের মোট ভরই বলতে গেলে পরমাণুর ভর। ইলেকট্রনগুলো কিন্তু নিউক্লিয়াসের বাইরে স্থির থাকতে পারে না, বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকে। যে পথগুলোতে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে তাকে বলা হয় কক্ষপথ।

পরমাণুর ভরসংখ্যা আর পারমাণবিক সংখ্যা :

কোনো মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যাই হলো তার পারমাণবিক সংখ্যা বা পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক। নিউক্লিয়াসে প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যার যোগফলকেই বলা হয় তার ভরসংখ্যা। নীচে তোমাদের সোডিয়াম আর ক্লোরিনের পরমাণুর মডেল দেখানো হলো। ছবিতে ⊕11 মানে 11 টি প্রোটন, ◯12 মানে 12 টা নিউট্রন, ⊖ মানে ইলেকট্রন এইভাবে বুঝতে হবে। ছবি দেখে মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক, ভরসংখ্যা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য নীচের সারণিতে লেখো।

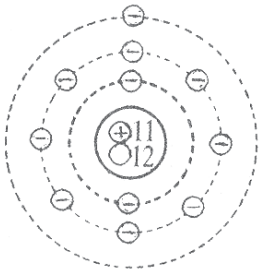

সোডিয়াম

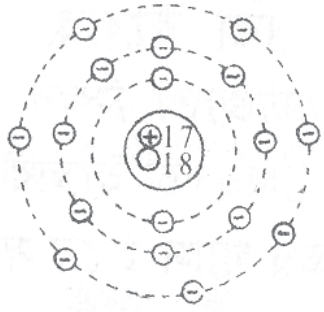

ক্লোরিন

মৌলের নাম	প্রোটন সংখ্যা	ইলেকট্রন সংখ্যা	নিউট্রন সংখ্যা	পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক	ভর সংখ্যা
সোডিয়াম					
ক্লোরিন					

পরমাণুর কেন্দ্র থেকে প্রোটন বা নিউট্রনকে বার করে আনতে প্রচুর পরিমাণ শক্তি লাগে। তারচেয়ে অনেক কম পরিমাণ শক্তি দিয়েই পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বার করে নেওয়া যায়। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার সময় পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের দিকের কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন বার করে আনা যেতে পারে। আবার সেই বাইরের কক্ষপথে ইলেকট্রনকে প্রবেশ করানো যেতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আয়নীয় যৌগ গঠিত হওয়ার সময় পরমাণুগুলো এইরকম ইলেকট্রন দেওয়া-নেওয়া করে।

আয়নদের কথা

কোনো পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে প্রোটন সংখ্যার চেয়ে ইলেকট্রন সংখ্যা কম হয়ে যায়। তখন পরমাণু থেকে ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়ন বা ক্যাটায়ন (cation) সৃষ্টি হয়। আবার পরমাণুতে এক বা একের বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন যুক্ত হলে তখন প্রোটন সংখ্যার চেয়ে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি হয়ে যায়। তখন পরমাণু পরিণত হয় ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়ন বা অ্যানায়নে (anion)।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধাতু আর অধাতুরা যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করার সময় সাধারণত ধাতুর পরমাণুগুলো ইলেকট্রন ছেড়ে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে, আর অধাতুর পরমাণুগুলো সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন তৈরি করে। এবার আমরা দেখব কী ভাবে ধাতব সোডিয়াম আর ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) তৈরি হয়।

ধাতব সোডিয়াম ও ক্লোরিন গ্যাস বিক্রিয়া করে যে সাদা রঙের কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করে তা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড। রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার সময় বহু লক্ষ কোটি সোডিয়াম পরমাণু ও ক্লোরিন অণু তাতে অংশ নেয়। কীভাবে আয়ন উৎপন্ন হয় তা বোঝার জন্য আমরা একটা Na পরমাণু থেকে একটা Na^+ আয়ন তৈরি, আর একটা Cl পরমাণু থেকে একটা Cl^- আয়ন তৈরির 'ছবি' দেখিয়েছি।

এবারে আমরা দেখব কীভাবে সোডিয়াম পরমাণু থেকে Na^+ আর ক্লোরিন পরমাণু থেকে Cl^- আয়ন তৈরি হয়।

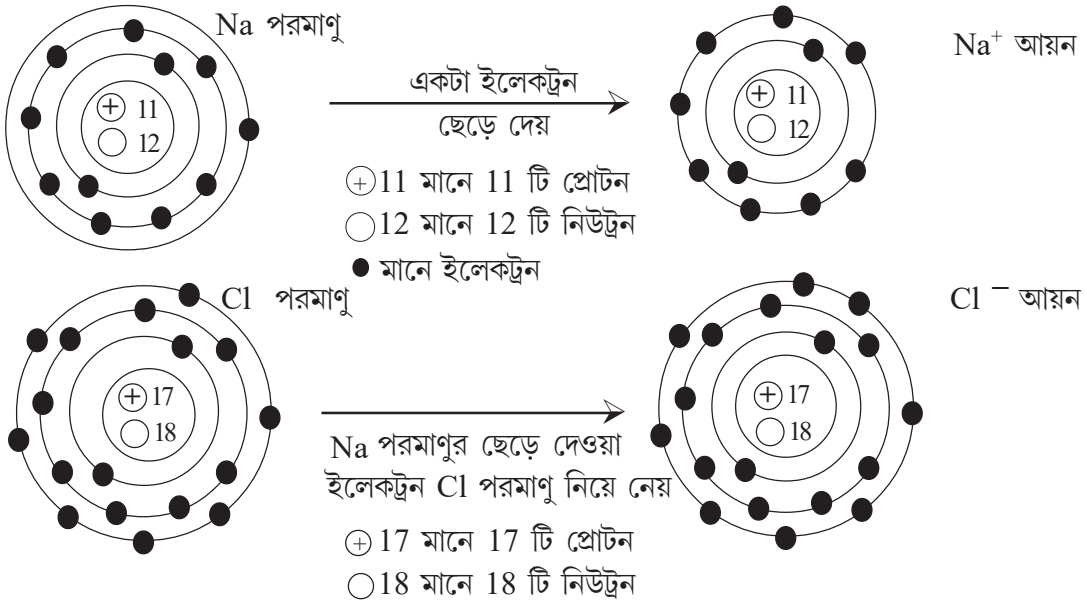

ধাতব সোডিয়াম আর ক্লোরিন গ্যাস রাসায়নিক বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইডের (নুন) সাদা কেলাস বা ক্রিস্টাল তৈরি করে। কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইডের চোখে দেখার মতো যেকোনো নমুনার মধ্যে বহু কোটি সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও সমান সংখ্যক ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) থাকে। সেই সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) গুলোর মধ্যে তড়িৎ আকর্ষণই বিপরীত আধানযুক্ত আয়নদের একত্রে কেলাসে ধরে রাখে। আয়ন দিয়ে তৈরি হয় বলে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে আয়নীয় যৌগ বলা হয়। পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি হলো আয়নীয় যৌগের আরও উদাহরণ। কোনো আয়নীয় যৌগেই অণুর কোনো অস্তিত্ব নেই। পরের পাতায় তোমাদের NaCl ক্রিস্টালের মধ্যে Na^+ আর Cl^- আয়নগুলো কেমনভাবে থাকে তার একটা মডেল দেখানো হলো।

NaCl ক্রিস্টালের মধ্যে Na^+ আর Cl^- আয়নগুলো কেমনভাবে থাকে তার মডেল

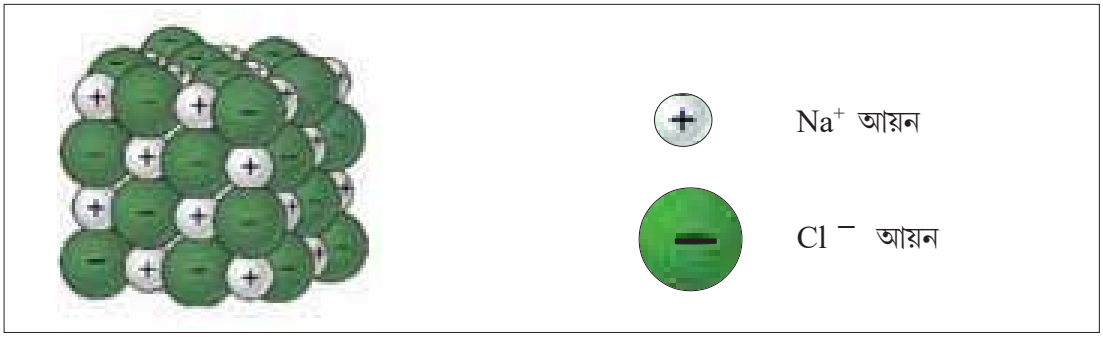

নীচের সারণিতে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুর পরমাণু থেকে কীভাবে তাদের আয়ন সৃষ্টি হয় তা বলা হলো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও।

কোন মৌলের পরমাণু	মৌলের চিহ্ন	কটি ইলেকট্রন নেয় বা ছেড়ে দেয়	তৈরি হওয়া ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের চিহ্ন ও নাম
পটাশিয়াম	K	1 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	K^+ (পটাশিয়াম)
ম্যাগনেশিয়াম	Mg	2 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	Mg^{2+}
জিঙ্ক	Zn	2 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	.....
অ্যালুমিনিয়াম	Al	3 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	.....
অক্সিজেন	O	2 টি ইলেকট্রন নিলে	O^{2-} (অক্সাইড)
সালফার	S	2 টি ইলেকট্রন নিলে	S^{2-} (সালফাইড)
ব্রোমিন	Br	1 টি ইলেকট্রন নিলে	..... (ব্রোমাইড)

কঠিন অবস্থায় বা জলীয় দ্রবণে আয়নীয় যৌগদের উপাদান হলো ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নগুলো।

আমরা জানি একাধিক মৌলের পরমাণু যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। কখনো কখনো একটি মৌলের এক বা একাধিক পরমাণু অথবা ভিন্ন মৌলের একাধিক পরমাণু একত্রিত হয়ে যে পরমাণু জোট গঠন করে তার ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান থাকে। এই আধানযুক্ত পরমাণু জোটগুলোকেই মূলক বলা হয়। এই মূলকগুলোও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে মূলকের আধানের পরিমাণ বোঝাতে আমরা যে সংখ্যা ব্যবহার করছি (+1, –1, +2, –2 ইত্যাদি) সেই (+ / – চিহ্ন ছাড়া) সংখ্যাকেই প্রাথমিকভাবে আমরা মূলকের যোজ্যতা বলে ধরতে পারি। নীচের সারণিটা দেখো।

মূলকের নাম	সংকেত	তার আধান বা চার্জ	যোজ্যতা
নাইট্রেট	NO_3^-	-1	1
সালফেট	SO_4^{2-}	.....	.....
কার্বনেট	CO_3^{2-}	.....	.....
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	+1	1
বাইকার্বনেট	HCO_3^-	.....	.....
ফসফেট	PO_4^{3-}	.....	.....
হাইড্রক্সাইড	OH^-	.....	.....

কোনো আয়নীয় যৌগে Na^+ আর K^+ -এর মত ক্যাটায়ন থাকলে তার সঙ্গে যুক্ত অ্যানায়নের বা মূলকের যোজ্যতা নির্ণয় করা সহজ। Na^+ আর K^+ আয়নের চার্জ নির্দেশ করার সংখ্যা হলো +1; আমরা শুধু 1 সংখ্যাটাই নেব। তাহলে এদের যোজ্যতা ধরা যাবে 1 এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্য মৌলের পরমাণু বা মূলকের যোজ্যতা তা থেকে বার করা যাবে। নীচের সারণি দেখো :

যৌগের সংকেত	যৌগে উপস্থিত অ্যানায়নের নাম ও সংকেত	অ্যানায়নের যোজ্যতা
Na_2S	সালফাইড (S^{2-})	2
$NaHCO_3$	বাইকার্বনেট (HCO_3^-)	.....
NaCN	সায়ানাইড (CN^-)	.....
KOH	হাইড্রক্সাইড (OH^-)	.....
$NaNO_3$	নাইট্রেট (NO_3^-)	.....

কোনো কোনো ধাতুর একাধিক যোজ্যতা থাকতে পারে। এইরকম ধাতু হলো আয়রন (লোহা) আর কপার (তামা)। এদের কম যোজ্যতার আয়নকে নামের শেষে '-আস্' আর বেশি যোজ্যতার আয়নকে নামের শেষে '-ইক' যোগ করে বোঝানো হয়। নীচের সারণি দেখো :

যৌগের নাম	সংকেত	ধাতুর আয়ন	আয়নের নাম	ধাতুর আয়নের যোজ্যতা
ফেরাস ক্লোরাইড	$FeCl_2$	Fe^{2+}	ফেরাস	2
ফেরিক ক্লোরাইড	$FeCl_3$	Fe^{3+}	ফেরিক	3
কিউপ্রাস ক্লোরাইড	CuCl	Cu^+	কিউপ্রাস	1
কিউপ্রিক ক্লোরাইড	$CuCl_2$	Cu^{2+}	কিউপ্রিক	2

আয়নীয় যৌগের সংকেত লিখব কী করে ?

বিভিন্ন মৌল কিংবা মূলকের যোজ্যতাকে ব্যবহার করে কীভাবে যৌগের সংকেত লেখা যায় তা দেখা যাক। ধরা যাক, A ও B দুটি মৌল বা মূলক যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। A মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা **m** এবং B মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা **n** হলে A এবং B দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত হবে A_nB_m। A মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা যত সেই সংখ্যাকে (m) B মৌলের বা মূলকের ডানদিকে একটু নীচে এবং B মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা যত সেই সংখ্যাকে (n) A মৌলের বা মূলকের ডানদিকে লিখে প্রকাশ করলে সেটি হবে A ও B মৌল বা মূলক দ্বারা তৈরি যৌগের সংকেত।

যেমন: (i) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত লিখতে হবে। Al-এর যোজ্যতা 3 ও O-এর যোজ্যতা 2। সংকেত তৈরির সময় চার্জের + বা − লেখা হয়না।

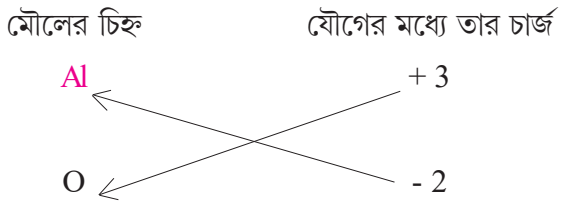

তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত এইরকমভাবে লেখা হলো: Al_2O_3।

(ii) অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত লেখার পদ্ধতি নীচে দেওয়া হলো।

NH_4^+ মূলকের যোজ্যতা 1 ও SO_4^{2-} মূলকের যোজ্যতা 2।

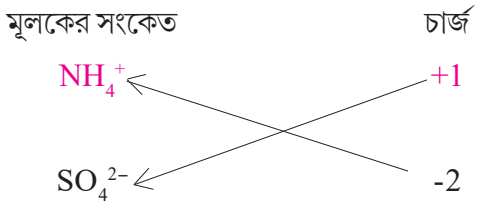

অতএব অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত $(NH_4)_2SO_4$।

এবারে এই পদ্ধতিতে নীচের কিছু আয়নীয় যৌগের সংকেত লেখার চেষ্টা করো :

যৌগের নাম	যৌগে উপস্থিত ধাতব আয়ন	যৌগে উপস্থিত ধাতব আয়নের যোজ্যতা	যৌগে উপস্থিত অ্যানায়ন বা মূলক	অ্যানায়ন বা মূলকের যোজ্যতা	যৌগের সংকেত
সোডিয়াম ফ্লুওরাইড	Na^+	1	F^-	1	NaF
.....	K^+	1	Br^-	1	.....
লেড ক্লোরাইড	Pb^{2+}	2	Cl^-	1	$PbCl_2$
অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড	Al^{3+}	3	OH^-	1	.....
.....	Na^+	.....	HCO_3^-	1	.....
ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট	Ca^{2+}	2	HCO_3^-	...	.....
জিঙ্ক নাইট্রেট	Zn^{2+}	.....	NO_3^-	...	.....
সোডিয়াম ফসফেট	Na^+	1	PO_4^{3-}	3	.....

এই উপায়ে জিঙ্ক অক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড, জিঙ্ক সালফাইড বা ক্যালশিয়াম কার্বনেটের সংকেত লিখবে কী করে?

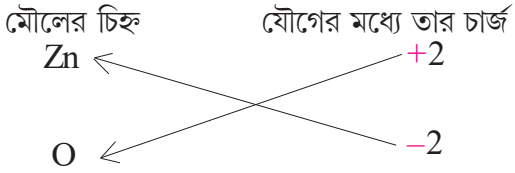

এইভাবে জিঙ্ক অক্সাইডের সংকেত হবার কথা Zn_2O_2 কিন্তু ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন উভয়ের পাশেই 2 থাকায় তা বাদ দিয়ে যৌগের সরলীকৃত সংকেত ZnO রূপে লেখা হয়। এই উপায়ে বাকি তিনটে যৌগের সংকেত লেখো।

আর একভাবেও আয়নীয় যৌগের সংকেত লেখা যায়। এক্ষেত্রে এমন সংখ্যার ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন নিতে হবে যাতে তাদের থেকে উৎপন্ন যৌগের মোট চার্জ শূন্য হয়। এর মানে হলো তুমি যতগুলো ক্যাটায়ন নেবে তাদের মোট পজিটিভ চার্জ অ্যানায়নদের মোট নেগেটিভ চার্জের সমান হতে হবে। আয়নীয় যৌগের ক্ষেত্রে তার সংকেত কিন্তু অণুর কথা বোঝায় না, বোঝায় যৌগে উপস্থিত ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের সংখ্যার অনুপাতকে।

এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

যৌগের নাম	যৌগে উপস্থিত ক্যাটায়ন	যৌগে উপস্থিত অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	মোট চার্জ শূন্য হলো কীভাবে	যৌগের সংকেত
সোডিয়াম ক্লোরাইড	Na^+	Cl^-	প্রত্যেক Na^+-এর 1টি (+) চার্জের জন্য 1টি (-) চার্জের দরকার	+1-1=0	NaCl
সোডিয়াম সালফেট	Na^+	SO_4^{2-}	SO_4^{2-}-এর চার্জ যেহেতু -2 তাই দুটি Na^+ ক্যাটায়ন দরকার	+2-2=0	Na_2SO_4
ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড	Mg^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Mg^{2+}-এর জন্য 2টি Cl^- দরকার	.....	.....
ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড	Ca^{2+}	Cl^-	.....	.....	.....
জিঙ্ক অক্সাইড	Zn^{2+}	O^{2-}	.....	.....	ZnO
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	Al^{3+}	O^{2-}	2টি Al^{3+}-এর মোট চার্জ +6 এবং 3টি O^{2-} -এর মোট চার্জ – 6	2(+3)+3(-2)=0	Al_2O_3
ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড	Mg^{2+}	O^{2-}	প্রত্যেক Mg^{2+}-এর জন্য 1টি O^{2-} দরকার	+2-2=0	MgO
ফেরিক অক্সাইড	Fe^{3+}	O^{2-}	.....	.....	Fe_2O_3

সতর্কতা : ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা ভৌতরাশির পরিমাপ ও তাদের এককের কথা জেনেছ। ইলেকট্রন ও প্রোটনের চার্জ বা আধানও পরিমাপযোগ্য রাশি এবং তার একক আছে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের চার্জের মান সমান কিন্তু চার্জের প্রকৃতি পরস্পরের বিপরীতধর্মী। প্রকৃতিতে ক্ষুদ্রতম যে পরিমাণ চার্জের বিনিময় ঘটা সম্ভব তার মান একটা ইলেকট্রনের চার্জের মানের সমান। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় পরমাণুরা যে পরিমাণ চার্জের আদানপ্রদান করে তা ইলেকট্রনের চার্জের পূর্ণসংখ্যার গুণিতক। তাই একটা Na^+ আয়নের চার্জ +1 কথাটার আসল মানে হলো ঐ সোডিয়াম আয়নটার একটা ইলেকট্রনের চার্জের সমপরিমাণ ধনাত্মক আধান আছে। আবার একটা ক্লোরাইড আয়নের চার্জ -1 কথাটার আসল মানে হলো যে ওর একটা ইলেকট্রনের আধানের সমান পরিমাণ ঋণাত্মক আধান আছে। আমাদের আলোচনাকে সহজ রাখার জন্য আমরা বারবার আধানের এককসহ পরম মান না লিখে চিহ্নসহ সংখ্যাগুলোই লিখেছি।

রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ

কী থেকে অনুমান করা যায় যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে?

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন থেকে আমরা প্রাথমিকভাবে ভাবতে পারি কোনো একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে। কোনো পরিবর্তনের সময় যদি নীচের এক বা একাধিক পর্যবেক্ষণ থাকে তা হলে প্রাথমিকভাবে মনে করা যেতে পারে যে সেটি রাসায়নিক পরিবর্তন, তবে নিশ্চিত হতে হলে বিস্তৃততর পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যদি : **(ক)** কোনো অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়, অথবা **(খ)** কোনো গ্যাস উৎপন্ন হয়, অথবা **(গ)** গন্ধ বা বর্ণের পরিবর্তন হয়, অথবা **(ঘ)** তাপ মুক্ত বা শোষিত হয় তাহলে বলা যেতে পারে কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। কোনো কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় আলো ও শব্দও উৎপন্ন হয়।

এসো এবারে কিছু খুব চেনা রাসায়নিক পরিবর্তনের বিষয়ে জানার চেষ্টা করি :

রাসায়নিক ঘটনা	কী থেকে পরিবর্তনটা বোঝা যায়
লোহায় মরচে ধরা	লোহার ওপরে লালচে-বাদামি রঙের ছোপ পড়া।
কাগজ পুড়ে যাওয়া	ছাই ও ধোঁয়া তৈরি হওয়া, বিশেষ গন্ধ বেরোনো, আলো আর তাপ উৎপন্ন হওয়া।
পোড়াচুনে জল দিয়ে কলিচুন তৈরি	জলের নীচে কাদার মতো পদার্থ (কলিচুন) জমা হওয়া, প্রচুর তাপ উৎপন্ন হওয়া।
কাঁসার বাসনে ছোপ ধরা	হলুদ রঙের কাঁসার বাসনে জায়গায় জায়গায় সবুজ ছোপ ধরা।
হলুদ-মাখা হাতে সাবান দেওয়া	হলুদ রং বদলে লালচে-কমলা হয়ে যাওয়া।

বিক্রিয়ক আর বিক্রিয়াজাত পদার্থ

আমরা এবারে পোড়াচুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার কথা একটু জানার চেষ্টা করি। যেসব মৌল বা যৌগ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় তাদের বলে বিক্রিয়ক, আর বিক্রিয়ায় যা উৎপন্ন হয় তাদের বলে বিক্রিয়াজাত পদার্থ। এবার দেখা যাক পোড়া চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় কী তৈরি হয়েছে আর যৌগগুলোর সংকেত কী। **নীচের সারণিটা দেখো :**

কী পদার্থ	যৌগের নাম কী	যৌগের সংকেত
বিক্রিয়ক	পোড়াচুন বা ক্যালশিয়াম অক্সাইড	CaO
	জল	H_2O
বিক্রিয়াজাত	কলি চুন বা ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড	$Ca(OH)_2$

আমরা যদি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থ (= বিক্রিয়ক) ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপে প্রকাশ করি তবে তাকে বলা হবে রাসায়নিক সমীকরণ। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখতে গেলে একের বেশি বিক্রিয়ক থাকলে তাদের সংকেতের মাঝে (+) চিহ্ন দিয়ে পাশাপাশি লেখা হয়। আবার বেশি বিক্রিয়াজাত পদার্থ থাকলে তাদের সংকেতের মাঝেও (+) চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়। এতে বোঝা যায় যে বিক্রিয়কগুলো একসঙ্গে বিক্রিয়া করেছে আর বিক্রিয়া ঘটে বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোও একই সঙ্গে তৈরি হয়েছে। তাহলে পোড়াচুন আর জলের বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হলো $CaO+H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ ।

আবার ধরো কাপড়কাচার সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3 আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) জল (H_2O) আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস (CO_2) উৎপন্ন হয়। এই বর্ণনাকে অনেক সংক্ষেপে সমীকরণের সাহায্যে লেখা যায়। সমীকরণটি হলো :

$$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2\,NaCl + CO_2 + H_2O$$

বিক্রিয়ক পদার্থ — বিক্রিয়াজাত পদার্থ

সমীকরণের সমতাবিধান করা

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু সৃষ্টি অথবা ধ্বংস হতে পারে না। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে-পরে পরমাণুর সংখ্যা সমান থাকতেই হবে। কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখার পরে তার দুদিকে প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সেই কারণেই আলাদা আলাদাভাবে সমান হতে হবে। ওপরের $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$ সমীকরণটা দেখো। HCl-এর

আগে 2 লেখা হলো কেন বাঁদিকে? ডানদিকেই বা 2NaCl লেখা হলো কেন? দেখো, বাঁদিকে Na_2CO_3 লিখে ডানদিকে শুধু NaCl লেখার অর্থ হলো দুদিকে সোডিয়াম (Na) পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়নি। তাই সেটা সমান করার জন্য ডানদিকে NaCl-এর আগে 2 দিয়ে গুণ করতে হলো। কোনো রাসায়নিক সমীকরণে মৌল বা যৌগের সংকেতের আগে 2 লেখার অর্থ হলো সেই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা বা যৌগে উপস্থিত সব মৌলের পরমাণুর সংখ্যাই 2 গুণ হয়ে গেল। এইরকমভাবে যেই আমরা Na পরমাণুর সংখ্যা মেলালাম, অমনি আরেকটা ব্যাপার বোঝা গেল : এখন ডানদিকে দুটো Cl পরমাণু আছে, আর Cl পরমাণুর যোগান দিচ্ছে বাঁদিকের HCl। তাই বাঁদিকে 2HCl লিখলেই Cl পরমাণুর সংখ্যাও মিলে যাবে। এবারে দেখো সমীকরণটায় সমস্ত পরমাণুর সংখ্যাই মিলে গেছে।

মনে রেখো : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বহু লক্ষ কোটি পরমাণু, অণু আর আয়ন অংশ নেয়। কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ সেই লক্ষ কোটির আভাস দেয় না, তাতে শুধু কোনটা ন্যূনতম কী অনুপাতে লাগবে তার হিসেব পাওয়া যায়। আর একটা কথা— সংকেত সবসময় অণু বোঝায় না। সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) হল আয়নীয় যৌগ, যার কোনো অণুর অস্তিত্ব নেই। তাই কখনই "এক অণু Na_2CO_3" বলা উচিত নয়।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা জায়গাগুলোয় উপযুক্ত সংখ্যা বসিয়ে রাসায়নিক সমীকরণগুলোর সমতাবিধান করো।

	বিক্রিয়ক			বিক্রিয়াজাত পদার্থ		
(i)	C	+ O_2	=	.....CO		
(ii)	Fe_2O_3	+ C	=	.....Fe	+ .....CO	
(iv)	$2Pb(NO_3)_2$		=	.....PbO	+ .....NO_2	+ O_2
(vi)	P_4	+ .....I_2	=	.....PI_3		
(x)	.....NaOH	+ H_2SO_4	=	Na_2SO_4	+ ...H_2O	

রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ

আমরা এই আলোচনায় তিন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা বলব। এই তিন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হলো প্রত্যক্ষ সংযোগ, বিয়োজন ও বিনিময়।

প্রত্যক্ষ সংযোগ : যে ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুটি মৌলের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে যৌগ গঠিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ সংযোগ বলা হয়। ম্যাগনেশিয়াম তারকে খোলা হাওয়ায় জ্বালালে যে দুটো বিক্রিয়া ঘটে তা হলো প্রত্যক্ষ সংযোগ :

$2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO$ (ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড) $\qquad 3Mg + N_2 \longrightarrow Mg_3N_2$ (ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইড)

কার্বনের দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হওয়াও প্রত্যক্ষ সংযোগ: $C + O_2 \longrightarrow CO_2$

বিয়োজন : বিয়োজন বিক্রিয়া হলো সেই ধরনের বিক্রিয়া যেখানে সাধারণত তাপ, তড়িৎ অথবা আলোর প্রভাবে কোনো অপেক্ষাকৃত জটিল যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়ে তার উপাদান মৌলে অথবা সরলতর যৌগে পরিণত হয়।

তড়িতের প্রভাবে বিয়োজন : সামান্য অ্যাসিড-মেশানো জলে ব্যাটারি ও তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে তড়িৎ পাঠালে জলের বিয়োজনে হাইড্রোজেন গ্যাস ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় : $2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$

তাপের প্রভাবে বিয়োজন : (i) মারকিউরিক অক্সাইডের তাপ বিয়োজনে মার্কারি ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় :

$$2HgO \longrightarrow 2Hg + O_2$$

(ii) চুনাপাথরের ($CaCO_3$) তাপ বিয়োজনে পোড়াচুন (CaO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস (CO_2) উৎপন্ন হয় :

$$CaCO_3 \xrightarrow[1000^oC]{} CaO + CO_2$$

বিনিময় বিক্রিয়া : জলে খানিকটা সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$) দ্রবীভূত করার পরে তার সঙ্গে সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) দ্রবণ মেশালে সিলভার ক্লোরাইডের ($AgCl$) সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। বিক্রিয়ার সামগ্রিক সমীকরণ হলো :

$$NaCl\ (\text{দ্রবণ}) + AgNO_3\ (\text{দ্রবণ}) \rightarrow AgCl\ (\text{কঠিন অধঃক্ষেপ}) + NaNO_3\ (\text{দ্রবণ})$$

সমীকরণ দেখে আপাতদৃষ্টিতে Cl^- আয়ন বিনিময় ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। কী করে হলো? $NaCl$ ও $AgNO_3$ আয়নীয় যৌগ। আয়নীয় বিচারে এই সমীকরণকে লেখা যায় :

$$Na^+(\text{দ্রবণ}) + Cl^-(\text{দ্রবণ}) + Ag^+(\text{দ্রবণ}) + NO_3^-(\text{দ্রবণ}) \rightarrow \overset{+}{Ag}\overset{-}{Cl}\ (\text{কঠিন অধঃক্ষেপ}) + Na^+(\text{দ্রবণ}) + NO_3^-(\text{দ্রবণ})$$

একইভাবে সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) ও বেরিয়াম ক্লোরাইডের ($BaCl_2$) দ্রবণ মেশালে বেরিয়াম সালফেটের ($BaSO_4$) সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। বিক্রিয়ার সামগ্রিক সমীকরণ হলো :

$$Na_2SO_4\ (\text{দ্রবণ}) + BaCl_2\ (\text{দ্রবণ}) \rightarrow 2NaCl\ (\text{দ্রবণ}) + BaSO_4\ (\text{কঠিন অধঃক্ষেপ})$$

আয়নীয় বিচারে এই সমীকরণকে লেখা যায় :

$$2Na^+(\text{দ্রবণ}) + SO_4^{2-}(\text{দ্রবণ}) + Ba^{2+}(\text{দ্রবণ}) + 2Cl^-(\text{দ্রবণ}) \rightarrow 2Na^+(\text{দ্রবণ}) + 2Cl^-(\text{দ্রবণ}) + Ba^{2+}\ SO_4^{2-}(\text{কঠিন অধঃক্ষেপ})$$

নীচের সারণিতে দেওয়া বিক্রিয়াগুলোর সমীকরণ দেখে বিক্রিয়াগুলো কেমন ধরনের তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো:

বিক্রিয়ার সমীকরণ	কেমন ধরনের বিক্রিয়া
$C + O_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} CO_2$	
$2AgBr \xrightarrow{\text{সূর্যালোক}} 2Ag + Br_2$	
$CaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2NaCl$	
$2FeSO_4 \xrightarrow{\text{তাপ}} Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$	
$PCl_5 \xrightarrow{\text{তাপ}} PCl_3 + Cl_2$	
$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2H_2O + O_2$	
$2Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2PbO + 4NO_2 + O_2$	
$Na_2CO_3 + Pb(NO_3)_2 \rightarrow PbCO_3 + 2NaNO_3$	

মনে রাখা জরুরি :

- কোনো মৌল বা যৌগের চোখে দেখার মতো ক্ষুদ্রতম নমুনাতেও বহু লক্ষ কোটি পরমাণু বা অণু থাকে।
- চোখে দেখতে পাওয়ার মতো যে-কোনো বিক্রিয়ায় বহু লক্ষ কোটি অণু-পরমাণু অংশগ্রহণ করে।
- পরমাণুতে ইলেকট্রন যুক্ত হলে অ্যানায়ন আর পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বার করে নিলে ক্যাটায়ন উৎপন্ন হয়।
- আয়নীয় যৌগের অণু হয় না; কঠিন অবস্থার ও দ্রবণে আয়নীয় যৌগের আয়নগুলোই থাকে।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে সপ্তম শ্রেণির 'পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ যে মৌলটির নাম ল্যাটিন ভাষায় তার নাম থেকে গৃহীত হয়েছে তার চিহ্ন হলো — ক) Po খ) Pu গ) U ঘ) Hg

১.২ একটা কার্বন পরমাণুতে 6টা প্রোটন, 6টা নিউট্রন ও 6টা ইলেকট্রন আছে। এর মোট ভর **মোটামুটিভাবে** ধরলে — ক) 6টা প্রোটনের ভর খ) 6টা প্রোটনের ভর + 6টা নিউট্রনের ভর গ) 6টা প্রোটনের ভর + 6টা ইলেকট্রনের ভর ঘ) 6টা ইলেকট্রনের ভর + 6টা নিউট্রনের ভর

১.৩ সোডিয়াম ব্রোমাইডের সংকেত হলো — ক) Na_2Br_2 খ) Na_2Br গ) $NaBr_2$ ঘ) NaBr

১.৪ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত হলো — ক) AlO খ) Al_2O গ) Al_2O_2 ঘ) Al_2O_3

১.৫ একটি বিয়োজন বিক্রিয়ার সমীকরণের উদাহরণ হলো — ক) $CaO+2HCl \rightarrow CaCl_2+H_2O$ খ) $MgCO_3 \rightarrow MgO+CO_2$ গ) $KCl + AgNO_3 \rightarrow KNO_3+AgCl$ ঘ) $MgO + 2HCl \rightarrow MgCl_2+H_2O$

২. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

২.১ কঠিন এবং গলিত অবস্থায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে Na^+ ও Cl আয়ন উপস্থিত ।

২.২ ফেরাস যৌগের চেয়ে ফেরিক যৌগে আয়রনের যোজ্যতা কম।

২.৩ সোডিয়াম ক্লোরাইডের চোখে দেখার মতো নমুনায় বহু লক্ষ কোটি Na^+ ও Cl^- আয়ন থাকে।

৩. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

৩.১ একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।

৩.২ একটি বিনিময় বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।

৩.৩ একটি বিয়োজন বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।

৩.৪ সমীকরণটি সমিত করো : $KClO_3 \rightarrow KCl+O_2$

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলে যথাক্রমে বরফের গলনাঙ্ককে ধরা হয় — (ক) 100°, 212° (খ) 212°, 0° (গ) 32°, 0° (ঘ) 0°, 32°

১.২ ফারেনহাইট স্কেলের উর্ধ্ব ও নিম্ন স্থিরাঙ্ক যথাক্রমে — (ক) 100°, 0° (খ) 0°, 100° (গ) 212°, 32° (ঘ) 32°, 212°

১.৩ একটি থার্মোমিটার দিয়ে সবচেয়ে কম উষ্ণতা (–1°) ও সবচেয়ে বেশি উষ্ণতা (99°) মাপা যায়। ঐ থার্মোমিটারে 1° করে মোট ঘর পাওয়া যাবে— (ক) 100 (খ) 99 (গ) 101 (ঘ) 98

১.৪ নীচের যেটি অপ্রভ বস্তু সেটি হলো — (ক) সূর্য (খ) জ্বলন্ত বাল্ব (গ) জ্বলন্ত কয়লা (ঘ) চাঁদ

১.৫ সোডিয়ামের ক্রমাঙ্ক 11 ও ভর সংখ্যা 23 হলে একটি সোডিয়াম পরমাণুতে — (ক) 11 টি প্রোটন ও 11 টি নিউট্রন আছে (খ) 11 টি প্রোটন ও 23 টি ইলেকট্রন আছে (গ) 11 টি প্রোটন ও 23 টি নিউট্রন আছে (ঘ) 11 টি প্রোটন ও 11 টি ইলেকট্রন আছে

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ মোমবাতি একটি _____ বস্তুর উদাহরণ।

২.২ _____ উৎস ও বিস্তৃত বস্তু হলে উপচ্ছায়া গঠিত হয় না।।

২.৩ _____ উৎস ও _____ বস্তু হলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া গঠিত হবে।

২.৪ যেকোনো বাস্তব আলোকউৎসকে অসংখ্য _____-এর সমষ্টি বলে ভাবা যায়।

২.৫ সূচিছিদ্র ক্যামেরার বস্তু ও ক্যামেরার দূরত্ব একই রেখে ক্যামেরার দৈর্ঘ্য বাড়ালে প্রতিকৃতি _____ হয়।

২.৬ একটা প্রোটন একটা ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় _____ গুণ ভারী।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ সব উষ্ণতায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের পাঠ পৃথক হবে।

৩.২ সেলসিয়াস স্কেলে 1° উষ্ণতার পার্থক্য আর ফারেনহাইট স্কেলে 1° উষ্ণতার পার্থক্য সমান।

৩.৩ দুটি সমান উষ্ণতার তামার টুকরো পরস্পরের সংস্পর্শে থাকলে সামগ্রিকভাবে কোনো তাপ বিনিময় ঘটবে না।

৩.৪ সোডিয়াম ক্লোরাইডের চোখে দেখার মতো নমুনায় বহু লক্ষ কোটি অণু থাকে।

৩.৫ $CaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2NaCl$ বিক্রিয়াটি বিনিময় বিক্রিয়া।

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৪.১ সেলসিয়াস স্কেলের C সংখ্যক ঘর ফারেনহাইট স্কেলে কত ঘরের সমান হবে?

৪.২ ফারেনহাইট স্কেলের 1^{o} সেলসিয়াস স্কেলের কত ডিগ্রির সমান?

৪.৩ SI পদ্ধতিতে তাপের একক কী?

৪.৪ কোনো পরমাণুর ক্রমাঙ্ক বলতে কী বোঝায়?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ হাতে স্পিরিট ঢাললে ঠান্ডা লাগে কেন?

৫.২ দুটি বস্তুর মধ্যে তাপের আদান-প্রদান হওয়া মধ্যেও উষ্ণতা বৃদ্ধি হচ্ছে না এমন হতে পারে কি? উদাহরণ দাও।

৫.৩ ''পরমাণুর ভর মোটামুটিভাবে তার নিউক্লিয়াসের ভরের সমান'' কথাটির স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৫.৪ সমীকরণটি সমিত করো : $P_4 + I_2 \rightarrow PI_3$

৬. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ স্নান করে ভিজে গায়ে চলন্ত পাখার নীচে দাঁড়ালে ঠান্ডা লাগে কেন?

৬.২ ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলোকরশ্মির গতিপথ কেমন হয় তার একটি চিহ্নিত রেখাচিত্র এঁকে দেখাও।

৬.৩ প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্রটিতে যা বলা হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৬.৪ সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুচ্ছ অসমান তলে প্রতিফলনের পরে সমান্তরাল থাকে না কেন?

4 পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- জীবদেহে কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় মৌলের (Fe, Na, K, Ca, N) গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
- প্রায় সমস্ত অতিপ্রয়োজনীয় মৌলই যে জীবদেহে যৌগাকারে গৃহীত হয় (মৌলরূপে নয়) সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।
- H^+ ও OH^- আয়নের সাপেক্ষে অ্যাসিড ও ক্ষারের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অ্যাসিড ও ক্ষারের ধারণাকে সমীকরণের সাহায্যে এবং H^+ ও OH^- আয়নের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে।
- অ্যাসিড ও ক্ষারের নিরাপদ ব্যবহারের উপায় উল্লেখ করতে পারবে।

জীবদেহ গঠনে জৈব ও অজৈব পদার্থের ভূমিকা :

পৃথিবীতে বেশিরভাগ যৌগ যা দিয়ে তৈরি তা প্রকৃতিজাত মৌল দিয়েই তৈরি হয়েছে। প্রকৃতিতে 94টি মৌল পাওয়া গেলেও জীবদেহে কিন্তু তার সবকটিকেই পাওয়া যায় না। জীবদেহে যৌগ আকারে মাত্র 22টি মৌলই পাওয়া যায়। একটা খুব দরকারি কথা হলো এই যে পৃথিবীপৃষ্ঠে (ভূত্বকে) নানান যৌগ আকারে যেসব প্রধান মৌল আছে তার অনেকগুলো মানবদেহেও আছে। কিন্তু এই মৌলগুলোর শতাংশ মাত্রায় অনেকটা তফাৎ আছে। নীচের সারণিতে পৃথিবীপৃষ্ঠে আর মানবদেহে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান মৌল প্রতি 100 গ্রাম ভরে কতটা করে আছে তা দেখানো হয়েছে।

মানুষের দেহে মৌলের ওজনানুপাতিক শতাংশ		পৃথিবীপৃষ্ঠে মৌলদের ওজনানুপাতিক শতাংশ	
অক্সিজেন	65.0	অক্সিজেন	46.6
কার্বন	18.5	কার্বন	< 1
নাইট্রোজেন	3.3	অ্যালুমিনিয়াম	8.1
হাইড্রোজেন	9.5	আয়রন	5
ক্যালশিয়াম	1.5	ক্যালশিয়াম	3.6
ফসফরাস	1.0	সিলিকন	27.7
সোডিয়াম	0.2	সোডিয়াম	2.8
পটাশিয়াম	0.4	পটাশিয়াম	2.6

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানবদেহের ভরের প্রায় 96% হলো অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেনের সম্মিলিত ভর। শুধু মানবদেহেই নয় : ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, সপুষ্পক উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রাণীর দেহের উপাদান নিয়ে পরীক্ষা করলেও এই চারটি মৌলেরই প্রাধান্য দেখা যাবে। এই চারটি মৌল (O, H, C, N) দিয়ে নানান ধরনের যৌগ (আমরা বলব 'জৈব যৌগ') তৈরি হয়। এইসব জৈব যৌগ পৃথিবীপৃষ্ঠে, নিজে থেকে তৈরি হতে পারে না, কোনো না কোনো জীবের দেহেই এই ধরনের যৌগ তৈরির ক্ষমতা আছে। তোমরা জানো যে একাট সবুজ গাছ হাওয়া থেকে নেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর মাটি থেকে নেয় জল আর কিছু খনিজ লবণ। এই দুটো অজৈব উপাদান (জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড) থেকে শুরু করে নানান জটিল প্রক্রিয়ায় সবুজ গাছ তৈরি করে গ্লুকোজ, যা গাছের 'খাবার'। এই গ্লুকোজ হলো একরকমের জৈব যৌগ যা পৃথিবীপৃষ্ঠে নানান অজৈব যৌগের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই গ্লুকোজ অণুর নানান রকম রাসায়নিক পরিবর্তনে গাছের কোশে আরও কতরকমের জৈব যৌগ তৈরি হয়। এই যে নানান রকমের জৈব যৌগ তৈরির ক্ষমতা, এটাই জীবের ধর্ম। এই জৈব যৌগ তৈরির ক্ষমতাটা জীবজগৎ আর জড়জগতের তফাৎ করে দিয়েছে।

জীবদেহের নানান উপাদান

জল | নানান ধরনের আয়ন | প্রোটিন | কার্বোহাইড্রেট | লিপিড | নিউক্লিক অ্যাসিড

এসো আমরা জীবদেহে এই উপাদানগুলোর গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা শিখে নিই।

জল :

জীবদেহের ভরের বেশিরভাগই হলো জলের ভর। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের ভরের প্রায় 60% হলো জলের ভর। জলের যেসব ধর্ম জীবের দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো (i) জলের দ্রাবক ধর্ম আর (ii) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা।

(i) দ্রাবক ধর্ম :

জল বিভিন্ন ধাতব আয়ন, গ্যাসীয় পদার্থ (O_2 এবং CO_2), বিভিন্ন জৈব যৌগের ছোটো-বড়ো অণুকে দ্রবীভূত করতে পারে। এই দ্রবীভূত অবস্থাতেই এইসব অতি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ নানান রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। দ্রবীভূত অবস্থা থেকেই কোশ নানান প্রয়োজনীয় পদার্থ (আয়ন বা যৌগের অণু) সংগ্রহ করে। এই দ্রবীভূত অবস্থাতেই নানান প্রয়োজনীয় যৌগ দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, আর দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

(ii) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ :

জীবদেহে খাবার হজম করা হলো অন্যতম দরকারি কাজ। তুমি যখন ভাত বা রুটি খাচ্ছ তখন তাতে থাকা কার্বোহাইড্রেট অণুকে ভেঙে ফেলে ছোটো ছোটো অণুতে পরিণত করাই হলো সেসব খাবার হজমের আসল কথা। সেইসব বিক্রিয়ায় একটা বিক্রিয়ক হলো জল। তবে শুধু জল থাকলেই সেসব বিক্রিয়া তাড়াতাড়ি হবে না। সেই কাজটা তাড়াতাড়ি হতে চাই নানান উৎসেচক বা এনজাইম। উৎসেচকরা প্রধানত প্রোটিনজাতীয় যৌগ এবং দেহেই সেগুলো তৈরি হয়। উৎসেচকের কথা আমরা একটু পরেই পড়ব।

নানান ধাতব আয়ন :

টুকরো কথা

এই কথাগুলোর মানে কী? কথাগুলো কী সত্যি?

- "ছোটো মাছ খাওয়া ভালো, ওতে ক্যালশিয়াম আছে"।
- "ডাক্তারবাবু মা-কে ক্যালশিয়াম ট্যাবলেট খেতে দিয়েছেন।"
- "মেটে খেলে শরীর আয়রনের যোগান পায়।"

আমাদের দেহের কাজে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, আয়রন, কপার, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, আর, কোবাল্ট খুব প্রয়োজনীয় ধাতু। এদের কোনোটা ছাড়াই আমাদের চলবে না। এখানে আমরা মানবদেহের প্রয়োজনীয় চারটে ধাতুর (সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম আর আয়রন) গুরুত্ব সম্বন্ধে জানব।

প্রথমেই যে কথাটা আমাদের বুঝতে হবে তা হলো শরীরে আসলে এইসব ধাতুদের নানান যৌগ থাকে। শরীর সরাসরি ধাতুগুলোকে কাজে লাগাতে পারে না। আমাদের প্রয়োজনীয় ধাতব আয়নগুলো যৌগরূপে খাদ্য ও লবণের সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। কখনও শরীরে এদের ঘাটতি দেখা দিলে বিশেষ বিশেষ ওষুধের মাধ্যমেও এদের খেতে হয়। তুমি যখন ছোটো মাছ ভেজে খাচ্ছ তখন কিন্তু শরীরে ধাতব ক্যালশিয়াম ঢুকছে না, ঢুকছে মাছের হাড়ের গুঁড়ো। হাড়ের গুঁড়োয় আছে ক্যালশিয়ামের ফসফেট যৌগ। একে শরীর কাজে লাগাতে পারবে। আবার ক্যালশিয়াম ট্যাবলেটে থাকে ক্যালশিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) আর কিছু জৈব যৌগ। মেটে বা লিভারে আছে আয়রনের যৌগ। গর্ভবতী মহিলাকে যে আয়রন ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয়েছে তাতে কিন্তু লোহার গুঁড়ো নেই; আছে লোহার বিশেষ কিছু যৌগ যা শরীর কাজে লাগাতে পারবে।

আয়রন :

রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন প্রোটিন আমাদের দেহে অক্সিজেন পরিবহণ করে। ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) ছাড়া হিমোগ্লোবিন তৈরি হবে না। নানান উৎসেচকেরও চাই ফেরাস আয়ন।

ক্যালশিয়াম :

তোমার দেহে যদি হাড়ের তৈরি কঙ্কালটা না থাকত তাহলে কি তুমি হাঁটতে-চলতে পারতে? হাড়ের প্রধান উপাদান হলো ক্যালশিয়ামের ফসফেট যৌগ। দাঁতের গঠনেও ক্যালশিয়ামের যৌগ অপরিহার্য। কোশের বিভিন্ন রকম কাজেও ক্যালশিয়াম আয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের চাই ক্যালশিয়াম আয়ন (Ca^{2+})।

সোডিয়াম আর পটাশিয়াম :

দেহে স্নায়ুর অনুভূতি যেতে-আসতে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম আয়নের (Na^{+} আর K^{+}) পরিমাণ ঠিক থাকা খুব দরকার।

প্রোটিন :

প্রোটিন অণুগুলো আয়তনে জল, কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অক্সিজেন অণুর চেয়ে অনেক বড়ো হয়। প্রোটিনের অণু তৈরি হয় প্রধানত কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের অনেক পরমাণু জুড়েই। আমাদের দেহে প্রোটিন কী কাজে লাগে?

- তোমার হাত-পায়ের পেশি তৈরি হয়েছে প্রোটিন দিয়ে।
- কোশের মধ্যে কত রকমের বিক্রিয়া ঘটে, সে সব ঘটাতে গেলে যেসব এনজাইম লাগে তা প্রধানত প্রোটিনজাতীয় যৌগ।
- তোমার দেহে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রোটিন লাগে।
- তুমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছ তাতেও বিশেষ ধরনের প্রোটিন অপরিহার্য।

প্রোটিনের নানান উৎস

মাছ

মাংস

চিংড়ি

ডিম

কার্বোহাইড্রেট :

কার্বোহাইড্রেটের অণু হলো কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের অনেক পরমাণু জুড়ে তৈরি। আমাদের দেহে শক্তি যোগানোর প্রধান খাদ্য হলো কার্বোহাইড্রেট। এই কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে প্রধান হলো স্টার্চ। ভাত, রুটি, ভুট্টা, মুড়ি, খই, চিঁড়ে, আলু এইসব খাদ্যের প্রধান অংশই হলো স্টার্চ। স্টার্চ হজম হয়ে যে সরলতম কার্বোহাইড্রেট অণু পাওয়া যায় তা হলো গ্লুকোজ।

কার্বোহাইড্রেটের নানান উৎস

চাল

গম

ভুট্টা

লিপিড :

লিপিডের অণু গড়তে লাগে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণু। কোশের মধ্যে নানান বিক্রিয়া ঘটে লিপিড থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়। এছাড়াও লিপিডের কাজ আছে : চামড়ার নীচে লিপিডের মোটা স্তর দেহ থেকে তাপ বেরোতে বাধা দেয়। তাই তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক, মেরুভালুক আর পেঙ্গুইনের মত প্রাণীদের দেহে চর্বি বা লিপিডের পুরু স্তর থাকে। এই চর্বিস্তরই তাদের প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে বাঁচায়। আবার যেসব প্রাণী শীতঘুমে যায়, তারা সারা শীতকালে গর্তে বা বাসায় ঘুমিয়ে কাটাবার সময় তাদের শরীর কোথা থেকে শক্তি পায় জানো? তখন দেহে সঞ্চিত লিপিড থেকেই দেহ শক্তি উৎপাদন করে। শীতের দেশে যখন বরফ পড়ে, তখন নানান প্রাণী যেমন ইঁদুর, খরগোশ, ভালুক ইত্যাদি শীতঘুমে থাকে।

যেসব প্রাণীদের চামড়ার নীচে লিপিডের মোটা স্তর থাকে

হাম্পব্যাক তিমি

মেরুভালুক

পেঙ্গুইন

নিউক্লিক অ্যাসিড :

কোনো উদ্ভিদ আর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তারা কেমন দেখতে হবে তা ঠিক করে দেয় যেসব যৌগ, তা হলো নিউক্লিক অ্যাসিড। তোমরা হয়তো ডিএনএ-র (DNA) কথা শুনেছ। DNA হলো একরকমের নিউক্লিক অ্যাসিড, যা তৈরি হয় কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর ফসফরাসের পরমাণু দিয়ে।

নীচের সারণিতে প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ ও জলের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো। সারণির দুটি স্তম্ভের কথা গুলোকে যথাযথভাবে মেলাও।

পদার্থ	প্রাণীদেহে তার গুরুত্ব
1. জল	a) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারক
2. লিপিড	b) শক্তি উৎস; এর স্তর প্রাণীদের ঠান্ডা থেকে বাঁচায়
3. কার্বোহাইড্রেট	c) দ্রাবক, কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক
4. নিউক্লিক অ্যাসিড	d) মূলত শক্তি উৎস

অ্যাসিড ও ক্ষার

তোমরা নানান রকমের টক স্বাদের খাবার খেয়েছ। যেমন ধরো কুল, আমড়া, কমলালেবু, তেঁতুল, টক দই ইত্যাদি। এদের একটাই মিল, সেটা হলো ঐ টক স্বাদ। ল্যাটিন ভাষায় অ্যাসিডাস (acidus) শব্দের মানে 'টক'। সেইখান থেকেই 'অ্যাসিড' (acid) কথাটা এসেছে। প্রথম দিকে মানুষ তো স্বাদের জন্য কোন কোন যৌগ দায়ী তা জানত না, তখন স্বাদের দিক থেকেই অ্যাসিড চিনত। অনেক পরে মানুষ বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগকে 'অ্যাসিড' বলে চিনেছে। অ্যাসিড আছে এমন খাদ্য, পানীয় বা দ্রবণকে অ্যাসিডিক (acidic = আম্লিক) বলা হয়। এসো দেখি আমাদের পরিচিত নানান ফলে আর অন্যান্য খাদ্যে প্রধানত কী কী অ্যাসিড থাকে।

এসো আমরা জেনে নিই আমাদের পরিচিত নানান জিনিসের মধ্যে কী কী অ্যাসিড আছে :

আপেল	ম্যালিক অ্যাসিড
পাতিলেবু	সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকরবিক অ্যাসিড
কমলালেবু	সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকরবিক আসিড
তেঁতুল	টারটারিক অ্যাসিড
টম্যাটো	ম্যালিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড
দই	ল্যাকটিক অ্যাসিড
ভিনিগার	অ্যাসেটিক অ্যাসিড
মিউরিয়েটিক অ্যাসিড	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

টুকরো কথা

শুধু কি খাদ্যেই অ্যাসিড থাকে ? — মোটেই না। সারা পৃথিবীতে বছরে লক্ষ লক্ষ টন সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরি করা হয়। নিশ্চয়ই তার খুব দরকারি কোনো ব্যবহার আছে, তাই না? সালফিউরিক অ্যাসিড লাগে সার তৈরিতে, পেট্রোলিয়াম শোধন করতে। আরো দুটো অ্যাসিড মানুষ তৈরি করে নানান প্রয়োজনে। তা হলো নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)। সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে বলা হয় খনিজ অ্যাসিড।

নানান অ্যাসিডের একটা সাধারণ বিক্রিয়া :

অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে যদি একটু খাবার সোডা (সোডিয়াম বাইকার্বনেট, $NaHCO_3$) দ্রবণ মেশাও তাহলে দেখতে পাবে বুদবুদ বেরোচ্ছে। কেন এমন হলো? অ্যাসিড দ্রবণ খাবার সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস (CO_2) উৎপন্ন করে। ওই গ্যাসই দ্রবণ থেকে বুদবুদ আকারে বেরিয়ে আসে। একটু আগে তুমি যেসব অ্যাসিডের কথা জানলে তার প্রত্যেকটাই এই বিক্রিয়ায় সাড়া দেয়। খাবার সোডার দ্রবণে একটু পাতিলেবুর রস কিংবা ভিনিগার দিলেও বুদবুদ বেরোতে দেখা যাবে। যদি বাড়িতে বা স্কুলে এই পরীক্ষা করতে চাও তবে সাবধান থাকতে হবে: অ্যাসিড বা ক্ষারের দ্রবণ চোখে পড়লে চোখের ক্ষতি হয়। তাই পরীক্ষা করার সময় শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নিতে হবে।

তোমরা যেসব অ্যাসিডের নাম শুনলে তার মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে খাবার সোডার রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো :

$NaHCO_3$	+	HCl	→	NaCl	+	CO_2	+	H_2O
দ্রবণে থাকে		দ্রবণে থাকে		দ্রবণে থাকে		গ্যাস হয়ে বেরোয়		দ্রবণে থাকে

অ্যাসিডের আর একটা সাধারণ বিক্রিয়া :

তোমরা জানো যে কোনো কোনো বিক্রিয়ায় রঙের বদল ঘটে। কিছু বিশেষ উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় লিটমাস (litmus) বলে একরকমের মিশ্রণ। লিটমাস হলো এমন পদার্থ যার রঙ অ্যাসিড দিলে লাল হয়ে যায়। দু রকমের দ্রবণ হিসেবে লিটমাস কিনতে

পাওয়া যায় — লাল লিটমাস দ্রবণ আর নীল লিটমাস দ্রবণ। এই নীল লিটমাস দ্রবণের একটা ফোঁটা অ্যাসিডের দ্রবণে দিলে তার রং হয়ে যায় লাল। অ্যাসিডটা হাইড্রোক্লোরিক না নাইট্রিক না সালফিউরিক না অ্যাসেটিক তা অবশ্য ঐ লাল হয়ে যাওয়া থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু নীল লিটমাস দ্রবণকে লাল করতে পারে অ্যাসিডিক দ্রবণই। তাই কোনো দ্রবণ অ্যাসিডিক কি না তা ঐ নীল লিটমাস দ্রবণের সাহায্যে বোঝা যায়। লিটমাসকে তাই বলা হয় নির্দেশক (indicator, ইন্ডিকেটর)। নীল লিটমাস দ্রবণে ফিল্টার কাগজের সরু টুকরো ডুবিয়ে শুকিয়ে নিলেও সেই কাগজ দিয়ে এই পরীক্ষা করা যায়।

ক্ষারধর্মী পদার্থ বলতে কী বোঝায়?

খাবার সোডার দ্রবণ, কাপড় কাচার সোডার দ্রবণ, কলিচুন - এসব নিয়ে তার সঙ্গে একটুখানি লাল লিটমাস দ্রবণ দিলে কী হবে? দেখা যাবে যে সবকটার সংস্পর্শেই লাল লিটমাস দ্রবণ নীল হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এই বিক্রিয়া এইসব পদার্থের (খাবার সোডা, কাপড় কাচার সোডা, কলিচুন) একটা সাধারণ ধর্ম। কাপড় কাচার সোডা (Na_2CO_3), কলিচুন ($Ca(OH)_2$), খাবার সোডা ($NaHCO_3$) এগুলোর সবকটা যৌগই অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যাসিডের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে, আর লাল লিটমাসকে নীল করে দেয়। এছাড়াও তোমরা কস্টিক সোডা (NaOH), কস্টিক পটাশ (KOH) এইসব জিনিসের নামও শুনেছ। এই দুটো যৌগও লাল লিটমাস দ্রবণকে নীল করে দিতে পারে, আর অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যাসিডের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে। এদের মধ্যে NaOH আর KOH-কে বলা হয় ক্ষার (alkali), আর সবকটাকে (NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $NaHCO_3$, Na_2CO_3) একসঙ্গে ক্ষারধর্মী পদার্থ (basic substance) বলা হয়। মনে রেখো : লিটমাসের সাহায্যে কোনো দ্রবণ ক্ষারীয় কি না তা বোঝা যায়; কিন্তু লাল লিটমাস দ্রবণ নীল হয়ে যাওয়া থেকে ক্ষারধর্মী যৌগটা আসলে কী অর্থাৎ NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $NaHCO_3$, Na_2CO_3 এর মধ্যে কোনটা তা বোঝা যায় না।

বিভিন্ন নির্দেশক নিয়ে পরীক্ষা :

আমরা তোমাদের একটা উদ্ভিজ্জ নির্দেশকের কথা বলেছি, সেটা হলো লিটমাস। লিটমাস আসলে একাধিক যৌগের মিশ্রণ। মানুষের তৈরি দুরকমের অ্যাসিড-ক্ষার নির্দেশক হলো মিথাইল অরেঞ্জ আর ফেনলথ্যালিন। অ্যাসিড ও ক্ষারের দ্রবণে নির্দেশকদের রং কী রকম হয় তা নীচের সারণিতে বলা হলো।

নির্দেশক	ক্ষারীয় দ্রবণে রং	আম্লিক দ্রবণে রং
লিটমাস	নীল	লাল
মিথাইল অরেঞ্জ	হলুদ	লাল
ফেনলথ্যালিন	গোলাপি	বর্ণহীন

এইসব নির্দেশক ছাড়াও জবাফুলের পাপড়ি আর হলুদের গুঁড়োয় এমন সব জৈব যৌগ আছে যারা অ্যাসিড ও ক্ষারের দ্রবণে রং বদলায়। এদের প্রাকৃতিক নির্দেশক (natural indicator) বলা যায়।

প্রশম পদার্থ :

যেসব পদার্থের জলীয় দ্রবণের আম্লিকতা বা ক্ষারীয়তা কোনো নির্দেশক দিয়েই ধরা যায় না প্রাথমিকভাবে তাদের প্রশম (neutral) পদার্থ বলা হয়। আমাদের সবচেয়ে চেনা দ্রাবক জল হলো এইরকম পদার্থ। কোনো নির্দেশক দিয়েই জলের আম্লিক বা ক্ষারীয় ধর্ম ধরা যায় না। তাই জলকে প্রাথমিকভাবে প্রশম প্রকৃতির দ্রাবক বলা যেতে পারে।

আয়নীয় ধারণার সাহায্যে অ্যাসিড ও ক্ষার :

জলীয় দ্রবণে সব অ্যাসিডের অণুই আয়নে ভেঙে যায় এবং সব অ্যাসিডই একটা সাধারণ (common) আয়ন উৎপন্ন করে। সেই আয়ন হলো হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)। জলীয় দ্রবণে অ্যাসিডের অণু থেকে H^+ আয়ন ও অ্যাসিডের অ্যানায়ন উৎপন্ন হয়।

এই বিক্রিয়াকে অ্যাসিডের বিয়োজন বিক্রিয়া বলা যেতে পারে। **নীচের সারণি দেখো :**

অ্যাসিডের নাম	সংকেত	জলীয় দ্রবণে বিয়োজনের সমীকরণ	মিল কোথায়
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	HCl	$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$	সব ক্ষেত্রেই H^+ (হাইড্রোজেন আয়ন) উৎপন্ন হচ্ছে
নাইট্রিক অ্যাসিড	HNO_3	$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$	
সালফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_4	$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$	
অ্যাসেটিক অ্যাসিড	CH_3COOH	$CH_3COOH \leftrightarrows H^+ + CH_3COO^-$	

জলীয় দ্রবণে H^+ আয়ন মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না, জলের অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হাইড্রোনিয়াম আয়ন (H_3O^+) গঠন করে। আমরা তোমাদের সরল সমীকরণটুকুই দেখিয়েছি। অ্যাসিডগুলো দ্রবণে হাইড্রোনিয়াম আয়ন (H_3O^+) দেয় আর ক্ষারগুলো (NaOH, KOH) দ্রবণে হাইড্রক্সাইড (OH^-) আয়ন উৎপন্ন করে। নীচের সমীকরণ দুটো দেখো :

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ $\qquad\qquad$ $KOH \rightarrow K^+ + OH^-$

জলীয় দ্রবণে ক্ষারীয় যৌগ থেকে উৎপন্ন হাইড্রক্সাইড (OH^-) আয়ন অ্যাসিডের হাইড্রোনিয়াম আয়নের (H_3O^+) সঙ্গে বিক্রিয়া করে জলের অণু উৎপন্ন করে। অ্যাসিড ও ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। **নীচের সমীকরণগুলো দেখো :**

HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H_2O
অ্যাসিড		ক্ষার		লবণ		জল
HNO_3	+	KOH	→	KNO_3	+	H_2O
অ্যাসিড		ক্ষার		লবণ		জল
H_2SO_4	+	2NaOH	→	Na_2SO_4	+	H_2O
অ্যাসিড		ক্ষার		লবণ		জল

বিশুদ্ধ জলের মধ্যে H^+ ও OH^- আয়নের পরিমাণ খুবই কম এবং তা নির্দেশকের সাহায্যে ধরা যায় না। তাই জলকে প্রাথমিকভাবে প্রশম প্রকৃতির দ্রাবক বলা যেতে পারে।

লিটমাস সাপেক্ষে আম্লিক, ক্ষারীয় আর প্রশম পদার্থের তুলনা :

বৈশিষ্ট্য	আম্লিক পদার্থ	প্রশম পদার্থ	ক্ষারীয় পদার্থ
নীল লিটমাসের উপর ক্রিয়া	নীল লিটমাসকে লাল করে	নীল লিটমাসের রং অপরিবর্তিত থাকে	নীল লিটমাসের রং অপরিবর্তিত থাকে
লাল লিটমাসের উপর ক্রিয়া	লাল লিটমাসের রং অপরিবর্তিত থাকে	লাল লিটমাসের রং অপরিবর্তিত থাকে	লাল লিটমাসকে নীল করে

অ্যাসিড ও ক্ষারের ধর্মের তুলনা

অ্যাসিডের ধর্ম	ক্ষারের ধর্ম
১) অ্যাসিড নীল লিটমাস দ্রবণকে লাল করে।	১) ক্ষার লাল লিটমাস দ্রবণকে নীল করে।
২) খাবার সোডার দ্রবণ থেকে CO_2 গ্যাস মুক্ত করে।	২) খাবার সোডার দ্রবণ থেকে CO_2 মুক্ত করতে পারে না।
৩) জলীয় দ্রবণে হাইড্রোনিয়াম আয়ন (H_3O^+) উৎপন্ন করে।	৩) জলীয় দ্রবণে হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH^-) উৎপন্ন করে।

নীচের দ্রবণগুলো দিলে কোন ক্ষেত্রে লিটমাস কাগজের রং কী হবে এবং দ্রবণগুলোর প্রকৃতি (আম্লিক/ক্ষারীয়) কী তা সারণিতে লেখো।

কী নিয়েছ	লাল লিটমাস কাগজের রং	নীল লিটমাস কাগজের রং	দ্রবণ আম্লিক /ক্ষারীয়
পাতিলেবুর রস			
চুন জল			

নীচের সারণিতে বিভিন্ন অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে কীভাবে বিয়োজিত হয় তা লেখো।

অ্যাসিডের নাম ও সংকেত	জলীয় দ্রবণে কীভাবে বিয়োজিত হয়
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)	
নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)	
সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)	

অ্যাসিড ও ক্ষারের নিরাপদ ব্যবহার :

মনে রেখো, দেহের কোথাও অ্যাসিড বা ক্ষারীয় পদার্থ লাগলে, বিশেষ করে চোখে বা নাকে গেলে, সেই জায়গাটা অনেকটা পরিষ্কার জল দিয়ে বারবার ধুয়ে ফেলা দরকার। রগড়ে ধোবে না বা সাবান দেবে না। তারপর পরিষ্কার কাপড় বা তুলো দিয়ে আলগা করে ঢেকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। কেউ অ্যাসিড বা ক্ষার খেয়ে ফেললে কোনোরকম দেরি না করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দেয়াল চুনকামের সময় কাছে যাবে না। সকলকে সতর্ক করবে যে ক্ষার চোখে পড়লে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

ব্যবহারিক কাজে অ্যাসিড ও ক্ষারের উপযোগিতা :

পুকুরে মাছ চাষ করার সময় যদি দেখা যায় যে পুকুরের জল আম্লিক (অ্যাসিডিক) হয়ে গেছে তখন তাতে পরিমাণ মত কলিচুন ($Ca(OH)_2$) দেওয়া হয়। তখন জলের আম্লিকতা কমে। আবার চাষের ক্ষেতের মাটি যদি আম্লিক হয়ে যায় তা হলে তাতে ভালোভাবে চাষ করা যায় না। তখনও আম্লিক মাটিতে কলিচুন দিয়েই আম্লিকতা কমাতে হয়।

মনে রাখা জরুরি :

- যখন আমরা বলি শরীরের কাজে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম বা আয়রন প্রয়োজন, তখন আসলে ধাতু নয়, তার বিশেষ বিশেষ যৌগের কথা বোঝানো হয়।
- জল একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে।
- উৎসেচক বা এনজাইম ছাড়া কোশের পক্ষে দরকারি প্রায় কোনো বিক্রিয়াই তাড়াতাড়ি ঘটতে পারবে না।
- অ্যাসিড খাবার সোডার দ্রবণ থেকে CO_2 গ্যাসের বুদবুদ মুক্ত করে, ক্ষার তা করে না।
- জলীয় দ্রবণে H^+ আয়ন এককভাবে থাকতে পারেনা, H_3O^+ আয়ন রূপে থাকে।
- অ্যাসিড ও ক্ষারের দ্রবণ নিয়ে সাবধানে কাজ করা উচিত। চোখে পড়লে খুব ক্ষতি হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে ভালো জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে সপ্তম শ্রেণির 'পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ নীচের যে খাবারে দেহে রক্ত তৈরিতে শরীর কাজে লাগাতে পারবে লোহার এমন যৌগ আছে তা হলো—

(ক) ভাত (খ) ঘি

(গ) দুধ থেকে তৈরি ছানা (ঘ) মেটে বা লিভার

১.২ প্রোটিনের অণুতে কোন মৌলটির পরমাণু থাকতেই হবে —

(ক) সোডিয়াম (খ) পটাশিয়াম

(গ) ক্যালশিয়াম (ঘ) কার্বন

২. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

২.১ ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটে ধাতব ক্যালশিয়াম নেই, আছে তার যৌগ।

২.২ মেরু অঞ্চলের প্রাণীদের প্রবল ঠাণ্ডা থেকে বাঁচায় চামড়ার নীচে লিপিডের স্তর।

২.৩ অ্যাসিড লাল লিটমাসকে নীল করে।

২.৪ অ্যাসিড এবং ক্ষার চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

৩. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ দুরকম অ্যাসিড-ক্ষার নির্দেশকের উদাহরণ দাও।

৩.২ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিয়োজন বিক্রিয়াটির সমীকরণ লেখো।

৩.৩ জলীয় দ্রবণে কস্টিক সোডার বিয়োজন বিক্রিয়াটির সমীকরণ লেখো।

৩.৪ একটি দ্রবণ লিটমাস সাপেক্ষে আম্লিক। এই থেকে দ্রবণে উপস্থিত অ্যাসিডটিকে শনাক্ত করা যায় কি না লেখো।

৪. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ প্রাণীদেহে প্রোটিনের তিন রকমের কাজের কথা উল্লেখ করো।

৪.২ অ্যাসিড ও ক্ষারের ধর্মের তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

৪.৩ অ্যাসিড ও ক্ষারের দ্রবণ নিয়ে কাজ করার সময় কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন?

5 মানুষের খাদ্য

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনের উৎস ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্য সমস্যা আলোচনা করতে পারবে।
- ভিটামিন ও খনিজ মৌলের অভাবজনিত সমস্যা বর্ণনা করতে পারবে।

❖ ওপরের ছবিগুলোতে দেখানো কাজগুলো করতে শক্তির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কাজ করার শক্তি পাওয়া যায় খাদ্য থেকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহ ছোটো থেকে বড়ো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার দেহ বেড়ে উঠেছে। তাহলে এই দেহ গঠনের উপাদান কোথা থেকে পেয়েছো? দেহ গঠনের উপাদান খাদ্য থেকেই পেয়েছো।

❖ রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা বা তাদের ধ্বংস করার ক্ষমতাও খাদ্য থেকেই পাওয়া যায়। তাহলে বোঝা গেল যে, **দেহ গঠন, শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধক উপাদানের উৎস হলো খাদ্য**।

খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলো কী কী ধরনের হয় এসো দেখে নেওয়া যাক।

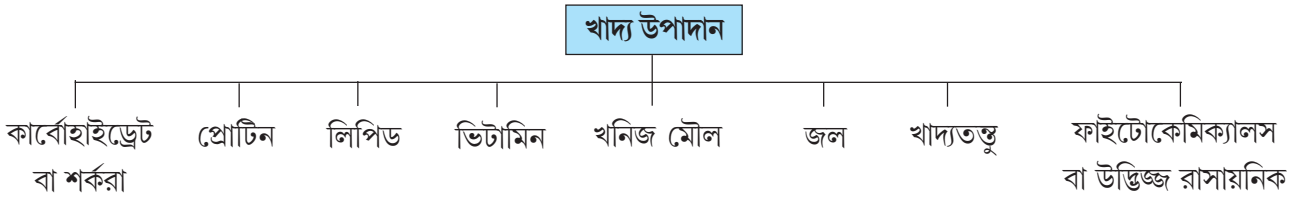

এসো এবারে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের উৎস ও গুরুত্ব সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক।

খাদ্য উপাদানের নাম, উৎস ও গুরুত্ব

খাদ্য উপাদানের নাম	উৎস	গুরুত্ব
কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা	**উদ্ভিজ্জ :** চাল গম ভুট্টা	কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য (শ্বেতসার) হজম হওয়ার পর সরলতম অণুতে (গ্লুকোজ) পরিণত হয়। রক্তের মাধ্যমে তা শরীরের বিভিন্ন কোশে পৌঁছে যায়। কোশের মধ্যে অক্সিজেনের

খাদ্য উপাদানের নাম	উৎস	গুরুত্ব
	পাকা আম আখ আলু প্রাণীজ : দুধ মধু	সাহায্যে গ্লুকোজ থেকে শক্তি মুক্ত হয়। এই শক্তির সাহায্যে দেহের নানা কাজ হয়।
প্রোটিন	উদ্ভিজ্জ : 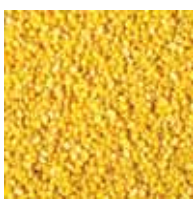 মুগ ডাল মসুর ডাল গম সয়াবিন মটরশুঁটি প্রাণীজ : রুই মাছ পাঁঠার মাংস দুধ ডিম	■ দেহে শক্তির উৎস রূপে কাজ করে। ■ দেহের বিভিন্ন অংশ বা কলা গঠনে (যেমন - চুল, নখ, পেশি, লোহিত রক্তকণিকা, অস্থি) সাহায্য করে। ■ দেহের ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। ■ শ্বাসবায়ু পরিবহণে সাহায্য করে। ■ দেহের কোনো জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত পড়লে রক্তের প্লাজমায় থাকা প্রোটিন রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে।

খাদ্য উপাদানের নাম	উৎস	গুরুত্ব
লিপিড	উদ্ভিজ্জ : বাদাম সরষের তেল নারকেল প্রাণীজ : মাখন ঘি ডিম	■ দেহে শক্তির উৎস রূপে কাজ করে। ■ দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। ■ দেহ থেকে তাপ বেরিয়ে যাওয়া কমিয়ে দেয়।
ভিটামিন ├ফ্যাটে দ্রবণীয় (A, D, E, K) └জলে দ্রবণীয় (B-কমপ্লেক্স, C) ভিটামিন A	উদ্ভিজ্জ : গাজর পেঁপে টম্যাটো প্রাণীজ : দুধ ডিম মাখন কড মাছের যকৃতের তেল থেকে তৈরি ওষুধ	■ চোখ, চামড়া, হাড় ও দাঁতের গঠন ঠিক রাখতে সাহায্য করে।

খাদ্য উপাদানের নাম	উৎস	গুরুত্ব
ভিটামিন D	দুধ ডিম মাখন কড মাছের যকৃতের তেল থেকে তৈরি ওষুধ এছাড়াও সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সহায়তায় মানুষের ত্বকে ভিটামিন D সংশ্লেষিত হয়।	■ ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাসের শোষণে সাহায্য করে। ■ হাড় ও দাঁতের গঠন স্বাভাবিক রাখে।
ভিটামিন E	**উদ্ভিজ্জ :** গমের অঙ্কুর নিঃসৃত তেল কাঠবাদাম সূর্যমুখী বীজের তেল লেটুস **প্রাণীজ :** দুধ ডিমের কুসুম	■ জারণ-প্রতিরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রূপে কাজ করে। ■ লোহিত রক্তকণিকা, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের সক্রিয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

খাদ্য উপাদানের নাম	উৎস	গুরুত্ব
ভিটামিন K	**উদ্ভিজ্জ :** বাঁধাকপি পালং শাক সয়াবিন তেল **প্রাণীজ :** দুধ মাখন	কেটে যাওয়া জায়গা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে।
ভিটামিন B কমপ্লেক্স	**উদ্ভিজ্জ :** বাঁধাকপি পালং শাক ঢেঁকিছাটা চাল **প্রাণীজ :** দুধ মুরগির মাংস ডিম	■ রক্তের কোশ গঠনে সাহায্য করে। ■ দেহের সার্বিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ■ ত্বক এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন বজায় রাখতে সাহায্য করে।

খাদ্য উপাদানের নাম	উৎস	গুরুত্ব
ভিটামিন C	কমলালেবু কাঁচা লঙ্কা টম্যাটো অঙ্কুরিত ছোলা ফুলকপি পেয়ারা	■ কোলাজেন প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে। কোলাজেন মানবদেহে অস্থি, তরুণাস্থি, ত্বক, টেনডনে থাকে। ■ লোহিত রক্তকণিকা গঠনে সাহায্য করে। ■ দাঁতের মাড়িকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
খনিজ মৌল সোডিয়াম	লবণ বীট দুধ	■ দেহে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
ক্যালশিয়াম	ফুলকপি দুধ সয়াবিন ঢেঁড়শ	■ দাঁত ও হাড় গঠনে সাহায্য করে। ■ পেশির সংকোচনে সাহায্য করে। ■ কোনো জায়গা কেটে গেলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
আয়রন	পালং শাক আমলকী ডিম মুরগির মাংস	■ রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন পরিবহণে সাহায্য করে।

খাদ্য উপাদানের নাম	উৎস	গুরুত্ব
আয়োডিন	সামুদ্রিক মাছ কড সার্ডিন স্যামন আয়োডিনযুক্ত লবণ	■ মানসিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।
জল	পানীয় জল, বিভিন্ন ফল, বিভিন্ন তরল পানীয় (ডাবের জল) ডাব	■ মানুষের শরীরের ওজনের প্রায় 60% হলো জল। ■ রক্তের প্রায় 55% হলো রক্তরস। আর রক্তরসের প্রায় 91-92% হলো জল। ■ জল দেহে দ্রাবক হিসেবে, তাপ পরিবাহক হিসেবে এবং বিক্রিয়ক হিসেবে কাজ করে।
খাদ্যতন্তু	সজনে ডাটা বাঁধাকপি আপেল ওট	■ পরিপাকনালিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ■ অন্ত্রের ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। ■ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।
ফাইটোকেমিক্যালস বা উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক	গাজর আঙুর পেঁপে বীট কমলালেবু টম্যাটো সবুজ চা	■ দেহে জারণ-প্রতিরোধী বা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে ভূমিকা আছে। ■ মানুষের অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধ করে। ■ হৃৎপিণ্ডকে ঠিক রাখে। ■ ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিড সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো এবার জেনে নেওয়া যাক।

খাদ্য উপাদানের নাম ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা

খাদ্য উপাদানের নাম	স্বাস্থ্য সমস্যা
কার্বোহাইড্রেট	রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোশে প্রবেশ করতে না পারলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে দেহের নানা অঙ্গে (হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, চোখ ইত্যাদি) সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় মধুমেহ বা ডায়াবেটিস।
প্রোটিন	শরীরে অতিরিক্ত প্রোটিন জমা হলে বাত ও কিডনি স্টোনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
লিপিড	শরীরে অতিরিক্ত লিপিড জমা হলে হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি ও যকৃতের নানা সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এসো এবারে দেখে নেওয়া যাক ভিটামিন এবং খনিজ মৌলের অভাবে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ভিটামিন এবং খনিজ মৌলের অভাবজনিত সমস্যা

ভিটামিন এবং খনিজ মৌল	অভাবজনিত সমস্যা
ভিটামিন	
ভিটামিন A	রাতে চোখে দেখতে সমস্যা হয়।
ভিটামিন D	হাড়ের বিকাশ স্বাভাবিক না হওয়া, হাড় বেঁকে যাওয়া, পা বেঁকে যাওয়া (রিকেট)।
ভিটামিন E	স্নায়ু ও পেশির সমস্যা।
ভিটামিন K	ক্ষতস্থানে রক্ত সহজে জমাট না বাঁধা।
ভিটামিন B কমপ্লেক্স	স্নায়ু সংক্রান্ত সমস্যা, অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা।
ভিটামিন C	মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া (স্কার্ভি)।
খনিজ মৌল	
সোডিয়াম	শরীরের বিভিন্ন অংশে খিঁচুনি, অসংলগ্ন কথাবার্তা।
ক্যালশিয়াম	হাড়ের বিকাশ স্বাভাবিক না হওয়া।
আয়রন	রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া।
আয়োডিন	গলগণ্ড বা গয়টার (থাইরয়েড গ্রন্থির অত্যধিক বৃদ্ধি)।

মনে রাখা জরুরি :

- দেহ গঠন, শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধক উপাদানের উৎস হলো খাদ্য।
- খাদ্যের উপাদানগুলো হলো — কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, ভিটামিন, খনিজ মৌল, জল, খাদ্যতন্তু ও ফাইটোকেমিক্যালস।
- কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিড দেহে মূলত শক্তির উৎস রুপে কাজ করে।
- ভিটামিন, খনিজ মৌল, খাদ্যতন্তু ও ফাইটোকেমিক্যালস বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- একটি খাদ্যে একাধিক উপাদান উপস্থিত থাকতে পারে। যেমন— পাকা আমে কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজ মৌল, খাদ্যতন্তু এবং জল থাকে।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির 'মানুষের খাদ্য' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

রাতে চোখে দেখতে সমস্যা হয় যে ভিটামিনের অভাবে সেটি হলো — (ক) ভিটামিন A (খ) ভিটামিন B (গ) ভিটামিন C (ঘ) ভিটামিন D।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ দৌড়োতে গেলে _____ প্রয়োজন হয়।

২.২ মাড়ি ফোলা ও রক্ত পড়া _____ অভাবে হয়।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

কমলালেবু থেকে পাওয়া যায় ভিটামিন B কমপ্লেক্স।

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৪.১ খাদ্যতন্তু পাওয়া যায় এমন একটি খাবারের নাম লেখো।

৪.২ কোন ভিটামিনের অভাবে ক্ষতস্থানে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ হাড় ও দাঁতের গঠন ঠিক রাখা কোন কোন ভিটামিনের কাজ?

৫.২ ভিটামিন B কমপ্লেক্সের অভাবে কী কী উপসর্গ দেখা দিতে পারে?

6 উদ্ভিদের দেহের গঠনগত বৈচিত্র্য

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশের (যেমন— মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ) মুখ্য গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশের রূপান্তর বর্ণনা করতে পারবে।
- উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।

নীচে কিছু খাবারের নাম দেওয়া আছে। খাবারগুলো উদ্ভিদের কোন অংশ থেকে পাওয়া যায় লেখো।

খাবার	উদ্ভিদের দেহের যে অংশ থেকে পাওয়া যায়
ভাত/রুটি ডাল পালং শাক ফুলকপি লাউ আম	

তাহলে তোমরা দেখলে যে আমাদের দৈনন্দিন খাবারের অনেকটাই আমরা উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পাই। এসো এবারে উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জেনে নিই।

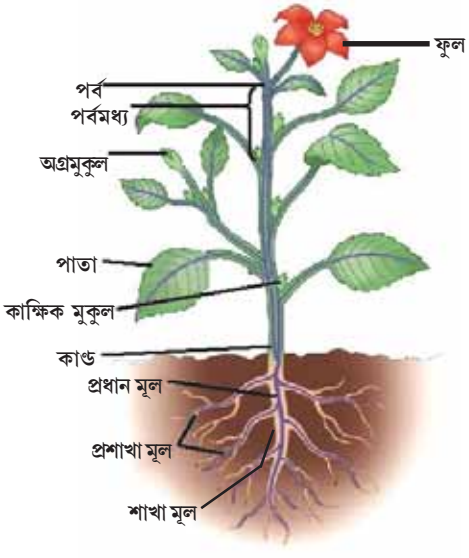

আদর্শ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের ছবি

মূল

❖ মূলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

আগের পৃষ্ঠায় আদর্শ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের যে ছবি দেওয়া আছে সেখানে মূলের অংশটা ভালো করে দেখো।

এসো এবারে মূলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নেওয়া যাক —

- মূলে কোনো গাঁট বা নোড নেই।
- মূলের একদম ডগায় একটা টুপির মতো অংশ আছে।
- মূলের নীচের দিকে, ডগার ঠিক ওপরের অংশে রোঁয়া রোঁয়া আছে।

❖ মূলের বিভিন্ন অংশ

পাশের ছবিটা দেখো। এসো মূলের অংশগুলো সম্বন্ধে জেনে নিই।

মূলের অংশের নাম	অংশের বর্ণনা	কাজ
মূলত্র অঞ্চল	মূলের একেবারে ডগায় একটা টুপির মতো অংশ থাকে। একে **মূলত্র** বলে। মূলের এই অংশটাই হলো মূলত্র অঞ্চল।	মূল মাটিতে ঢোকার সময় মূলের নরম অংশকে আঘাত থেকে রক্ষা করা।
বর্ধনশীল অঞ্চল	মূলত্রের ঠিক ওপরের অংশে কোনো রোঁয়া থাকে না। এটাই হলো মূলের বর্ধনশীল অঞ্চল।	এই অংশটা হলো মূলের বেড়ে ওঠার জায়গা। এই জায়গাটাতেই মূল লম্বায় বাড়তে থাকে।
মূলরোম অঞ্চল	মূলের বর্ধনশীল অঞ্চলের ঠিক ওপরে রোঁয়া রোঁয়া একটা জায়গা থাকে। এই রোঁয়ার মতো অংশগুলোর নাম **মূলরোম**। আর মূলের এই জায়গাটার নাম মূলরোম অঞ্চল।	মূলরোমগুলো দিয়ে উদ্ভিদ মাটি থেকে জল ও নানারকম খনিজ লবণ শোষণ করে।
স্থায়ী অঞ্চল	মূলরোম অঞ্চলের ওপরে মূলের যে অংশ থাকে সেই জায়গাটা হলো স্থায়ী অঞ্চল।	মাটির সঙ্গে উদ্ভিদকে শক্ত করে আটকে রাখা।

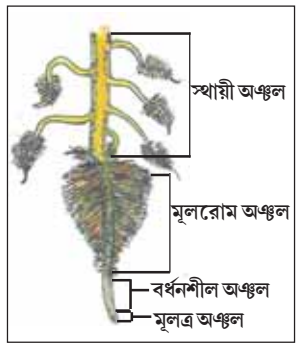

❖ মূলের প্রকারভেদ

মূলের প্রকারভেদ সম্বন্ধে জানার আগে নীচের ছবিটা দেখো।

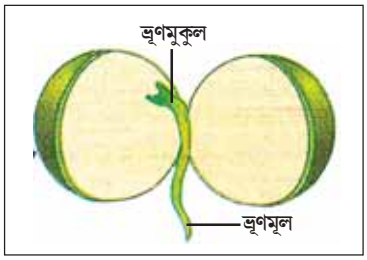

বীজের অঙ্কুরোদগমের (বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া) ফলে ভ্রূণমূল এবং ভ্রূণমুকুল তৈরি হয়।

এই ভ্রূণমূল থেকে মূল আর ভ্রূণমুকুল থেকে বিটপ তৈরি হয়।

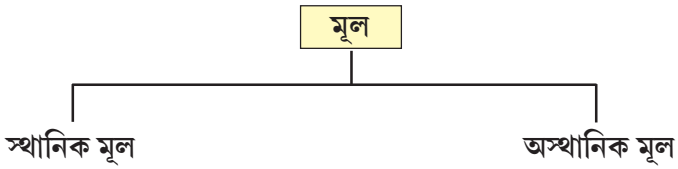

মূল

স্থানিক মূল　　　　অস্থানিক মূল

স্থানিক মূল

বীজের ভ্রূণমূল থেকে উৎপন্ন মূলকে **স্থানিক মূল** বা **প্রাথমিক মূল** বলে। প্রাথমিক মূল বৃদ্ধি পেয়ে **প্রধান মূল** গঠন করে। প্রধান মূল থেকে শাখা মূল, প্রশাখা মূল বেরোয়। যেমন— আম, জাম, কাঁঠাল, বট।

প্রধান মূল

অস্থানিক মূল

ভ্রূণমূল ছাড়া উদ্ভিদের অন্য কোনো অংশ (যেমন— কাণ্ড, পাতা) থেকে উৎপন্ন মূলকে **অস্থানিক মূল** বলে। গুচ্ছ মূল হলো একধরনের অস্থানিক মূল। যেমন— ধান, পাথরকুচি, ঘাস।

গুচ্ছ মূল

❖ **মূলের কাজ**

- ♦ শাখাপ্রশাখার সাহায্যে মূল উদ্ভিদকে দৃঢ়ভাবে মাটির সঙ্গে আটকে রাখে।
- ♦ মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে জল ও নানারকম খনিজ লবণ শোষণ করে।

রূপান্তরিত মূল

মূল উদ্ভিদকে মাটিতে ধরে রাখা এবং মাটি থেকে জল ও খনিজ পদার্থ শোষণ করা ছাড়া অন্যান্য কাজও করে। ফলে মূলের কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের মূলকে **রূপান্তরিত** বা **পরিবর্তিত মূল** বলে।

কয়েকটি রূপান্তরিত মূলের উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক—

ছবি	রূপান্তরিত মূল	কাজ
	মূলো	খাদ্য সঞ্চয় করা।
	বটগাছের ডালের মূল (স্তম্ভমূল)	শাখাপ্রশাখার ভার বহন করা।

ছবি	রূপান্তরিত মূল	কাজ
	রাস্নার (অর্কিড) মূল	বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প নিতে সাহায্য করে।
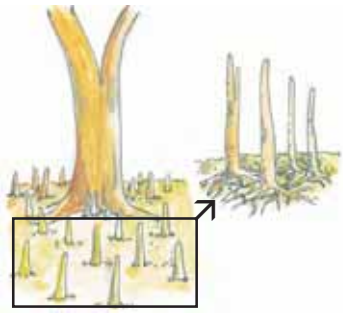	সুন্দরী গাছের মূল (শ্বাসমূল)	বাতাস থেকে শ্বাস নিতে সাহায্য করে।
	কেয়ার কাণ্ডের নীচের দিকের মূল (ঠেসমূল)	গাছকে ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

কাণ্ড

পাশের ছবিটা দেখো। আদর্শ কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ চিনে নিই এসো।

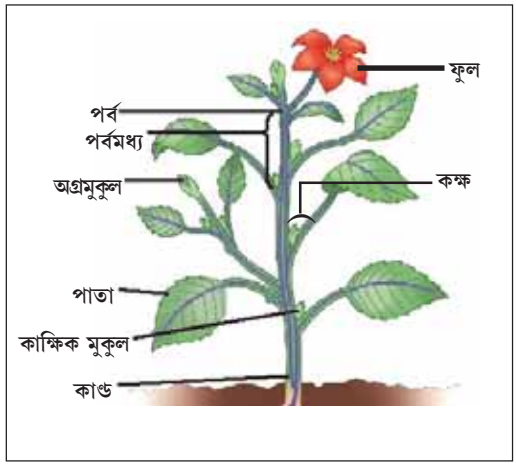

- **পর্ব :** কাণ্ডের যে ফোলা, গাঁটের মতো অংশ থেকে শাখাগুলো বেরিয়েছে তাকে বলে **পর্ব**।
- **পর্বমধ্য :** দুটো পর্বের মাঝখানের জায়গাটা হলো **পর্বমধ্য**।
- **পাতা :** শাখাপ্রশাখা বা কাণ্ডের পর্ব থেকে উৎপন্ন চ্যাপটা, প্রসারিত সবুজ রঙের অংশ হলো **পাতা**।
- **কক্ষ :** পর্ব থেকে উৎপন্ন পাতা বা শাখাপ্রশাখা আর কাণ্ডের মধ্যে যে কোণ তৈরি হয় তাকে **কক্ষ** বলে।
- **মুকুল :** মুকুল হলো সংকুচিত ও অবিকশিত বা অপরিণত বিটপ। কাণ্ডের অগ্রে উৎপন্ন মুকুল হলো **অগ্রমুকুল** আর কাণ্ডের কক্ষে উৎপন্ন মুকুল হলো **কাক্ষিক মুকুল**।
- **শাখাপ্রশাখা :** কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধি পেয়ে কাণ্ডের মতো যে অংশ গঠন করে তাকে **শাখা** আর শাখার কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধি পেয়ে যে অংশ গঠন করে তাকে **প্রশাখা** বলে।

এছাড়াও কাণ্ডে ফুল ও ফল দেখা যায়।

বিটপ : মাটির ওপরে কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা বা ডালপালা, পাতা, ফুল, ফল নিয়ে গাছের যে অংশ তাকে বিটপ বলে।

কাণ্ডের প্রকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী বীরুৎ, গুল্ম আর বৃক্ষ— এই তিন ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক।

বীরুৎ	এরা ছোটো ছোটো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাণ্ড কাষ্ঠল নয়, ডালপালা প্রায় নেই। কখনো-সখনো লতিয়ে বা পেঁচিয়ে চলে। এরা ছোটো গাছ। এরা হলো **বীরুৎ (Herbs)**। যেমন— ধান, মূলো, আদা।	 ধান
গুল্ম	এরা খুব বেশি লম্বা হয় না, কাণ্ড কাষ্ঠল, কিন্তু গুঁড়ি নেই, তবে অনেক ডালপালা আছে। ঝোপের মতো দেখতে লাগে। এরা মাঝারি জাতীয়। এরা হলো **গুল্ম (Shrubs)**। যেমন— জবা, গন্ধরাজ।	 জবা
বৃক্ষ বা গাছ	এরা লম্বা, এদের মোটা কাঠের গুঁড়ি ও অনেক ডালপালা আছে। এরা হলো গাছ বা **বৃক্ষ (Tree)**। যেমন — আম, বট।	 আম

❖ **কাণ্ডের কাজ**

- ♦ কাণ্ড শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে।
- ♦ কাণ্ড মূলের মাধ্যমে শোষিত জল ও খনিজ লবণকে পাতায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।
- ♦ কাণ্ড পাতায় উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

রূপান্তরিত কাণ্ড

বিশেষ কোনো কাজের জন্য বা পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কাণ্ডের কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের কাণ্ডকে **রূপান্তরিত** বা **পরিবর্তিত কাণ্ড** বলে। এরকম কয়েকটা রূপান্তরিত কাণ্ড সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক।

ছবি	রূপান্তরিত কাণ্ড	কাজ
	আলুর স্ফীতকন্দ (রূপান্তরিত মৃদগত বা ভূনিম্নস্থ কাণ্ড)	খাদ্য সঞ্চয় করা।
	কচুরিপানার খর্বধাবক (রূপান্তরিত অর্ধবায়বীয় কাণ্ড)	বংশবিস্তার করা।
	বেলের শাখাকণ্টক (রূপান্তরিত বায়বীয় কাণ্ড)	আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

পাতা

একটি আদর্শ পাতা সাধারণত পত্রমূল, পত্রবৃন্ত এবং পত্রফলক নিয়ে গঠিত হয়।

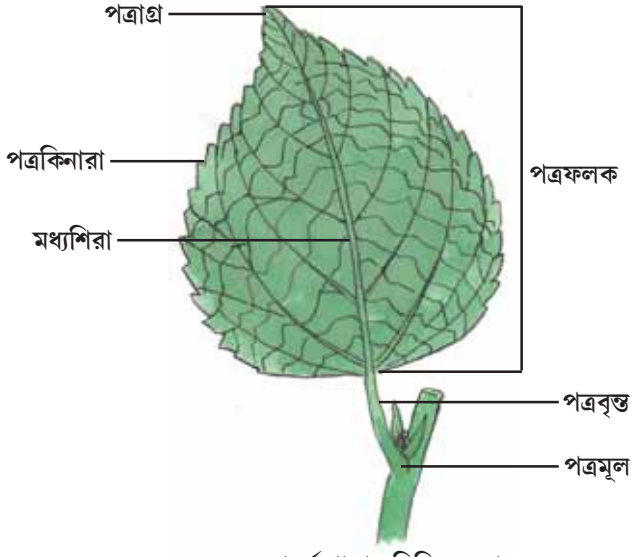

আদর্শ পাতার বিভিন্ন অংশ

আদর্শ পাতা

- **পত্রমূল**
- **পত্রবৃন্ত**
- **পত্রফলক**

পত্রমূল	পাতা এই অংশ দিয়ে কাণ্ড বা শাখাপ্রশাখার সঙ্গে যুক্ত থাকে।
পত্রবৃন্ত	• পত্রমূল ও পত্রফলকের মাঝখানের সরু দণ্ডাকার অংশ। • পত্রবৃন্তের কাজ পত্রফলককে ধরে রাখা।
পত্রফলক	• পত্রবৃন্তের শীর্ষে অবস্থিত সবুজ রঙের চ্যাপটা ও প্রসারিত অংশ। • ফলকের শীর্ষকে পত্রাগ্র বলে। • ফলকের দু-প্রান্তকে পত্রকিনারা বলে। • ফলকের মাঝখান দিয়ে মোটা মধ্যশিরা পত্রাগ্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। • মধ্যশিরা থেকে অনেকগুলি শিরা এবং শিরা থেকে অসংখ্য উপশিরা উৎপন্ন হয়ে ফলকে শিরাবিন্যাস সৃষ্টি করে। • **পত্রফলকের কাজ** ♦ পত্রফলক সবুজ বলে খাদ্য তৈরি করতে পারে। ♦ পত্রফলকে পত্ররন্ধ্র থাকায় গ্যাসের আদানপ্রদানে এবং বাষ্পমোচনে সাহায্য করে। ♦ শিরা-উপশিরা পাতায় জল, খনিজ লবণ ও খাদ্য পরিবহণে সাহায্য করে।

শিরাবিন্যাস

- **জালকাকার**
- **সমান্তরাল**

জবাপাতার ছবিটা দেখো। মাঝখানে মধ্যশিরা। এই শিরার দু-পাশ থেকে অনেকগুলো শিরা বেরিয়েছে। শিরাগুলো সব মিলে একটা জালের মতো তৈরি করেছে। এই ধরনের শিরাবিন্যাসকে **জালকাকার শিরাবিন্যাস** বলে। সাধারণত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে এই ধরনের শিরাবিন্যাস দেখা যায়।

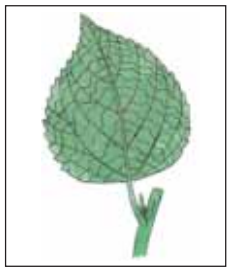

কলাপাতার ছবিটা দেখো। মাঝখানে মধ্যশিরা। মধ্যশিরার দু-পাশ থেকে সমান্তরালভাবে অনেকগুলো শিরা বেরিয়েছে। এই ধরনের শিরাবিন্যাসকে **সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** বলে। সাধারণত একবীজপত্রী উদ্ভিদে এই ধরনের শিরাবিন্যাস দেখা যায়।

❖ **পাতার কাজ**

- পাতায় উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি হয়।
- পাতার মাধ্যমে গ্যাসীয় পদার্থের আদানপ্রদান ঘটে।
- পাতা উদ্ভিদের বাষ্পমোচনে সাহায্য করে।

❖ **পাতার রূপান্তর**

খাদ্য তৈরি, গ্যাসের আদানপ্রদান বা বাষ্পমোচন ছাড়াও কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতা অন্যান্য কাজ করে। এর ফলে পাতার রূপান্তর ঘটে। কয়েক ধরনের পাতার রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ছবি	পাতার রূপান্তর	কাজ
	মটরের পত্রাকর্ষ	আরোহণে সাহায্য করে।
	ফণীমনসার পত্রকণ্টক	অতিরিক্ত বাষ্পমোচন রোধ করে এবং আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।
	পাথরকুচির রসালো পাতা	খাদ্য ও জল সঞ্চয় করে।
	কলসপত্রীর পাতা	পতঙ্গের দেহস্থিত নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করে।

একক পত্র ও যৌগিক পত্র

অশ্বত্থ পাতা একটি মাত্র ফলক দিয়ে গঠিত। ফলকের ধার সম্পূর্ণ অর্থাৎ এতে কোনো খণ্ড থাকে না। এই ধরনের পাতাকে **একক পত্র (Simple leaf)** বলে।

তেঁতুল পাতার ফলক মাঝখানের শিরা পর্যন্ত কতগুলো আলাদা আলাদা খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। এইধরনের পাতাকে **যৌগিক পত্র (Compound leaf)** বলে।

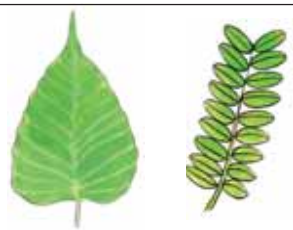

অশ্বত্থ পাতা তেঁতুল পাতা

ফুল

❖ একটি আদর্শ ফুল বাইরে থেকে ভেতরের দিকে কয়েকটি অংশ নিয়ে তৈরি। এই অংশগুলোকে এক-একটি **স্তবক** বলে। এই স্তবকই হলো ফুলের গঠনগত অংশ।

❖ স্তবকগুলি যে স্ফীত অংশের ওপর সজ্জিত থাকে তাকে **পুষ্পাক্ষ** বলে। আর পুষ্পাক্ষের ঠিক নীচে সবুজ রঙের বোঁটার মতো অংশটি হলো **পুষ্পবৃন্ত**।

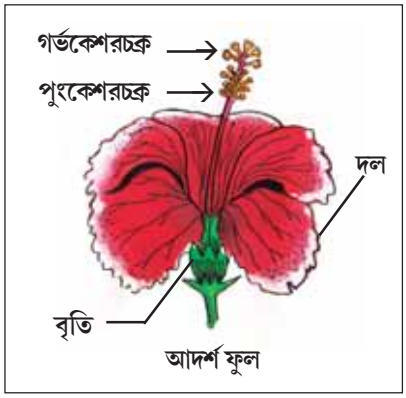

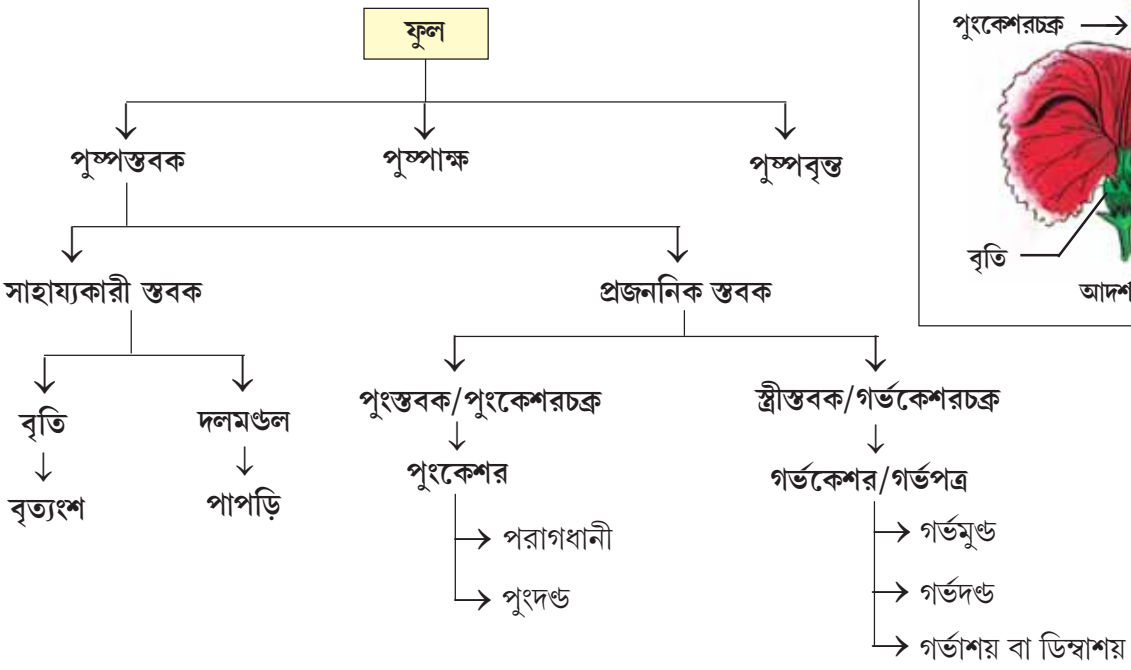

❖ **বৃতি :** ফুলের বোঁটার ঠিক ওপরে সবুজ রঙের ওল্টানো ঘণ্টার মতো অংশ।

- ♦ বৃতি ছোটো ছোটো পাতার মতো যে অংশ নিয়ে গঠিত তাকে বৃত্যংশ বলে।
- ♦ কুঁড়ি অবস্থায় বৃতি ফুলের অন্য স্তবকগুলিকে রক্ষা করে এবং সবুজ রঙের হওয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে।

❖ **দলমণ্ডল :** বৃতির ঠিক ভেতরে উজ্জ্বল বর্ণের, অনেকসময় মিষ্টি গন্ধযুক্ত অংশগুলো হলো পাপড়ি। সমস্ত পাপড়ি বা দল একত্রে তৈরি করে দলমণ্ডল। সাধারণভাবে ফুলের যে নানান রং দেখা যায় তা এই পাপড়িরই রং।

- ♦ পাপড়ির উজ্জ্বল রং ও মিষ্টি গন্ধ বিভিন্ন পোকা এবং পাখিদের আকৃষ্ট করে পরাগযোগে সাহায্য করে।

পুংকেশর এবং পুংকেশরচক্র :

❖ দলমণ্ডলের ভেতরে ফুলের তৃতীয় স্তবকটি পুং-প্রজননিক অংশ (পুংকেশর) নিয়ে গঠিত।

- ♦ প্রতিটি পুংকেশর প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত—
  - ■ সরু সুতোর মতো অংশটিকে বলে পুংদণ্ড।
  - ■ পুংদণ্ডের মাথায় থলির মতো অংশটিকে বলে পরাগধানী। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় পরাগধানীর মধ্যে পাউডারের মতো কিছু পদার্থ আছে। এগুলো হলো পরাগরেণু।
- ♦ অনেকগুলি পুংকেশর যখন একসঙ্গে থাকে তখন তাকে পুংকেশরচক্র বলা হয়।

গর্ভকেশর বা গর্ভপত্র এবং গর্ভকেশরচক্র :

❖ ফুলের চতুর্থ স্তবকটি স্ত্রী-প্রজননিক অংশ (গর্ভপত্র) নিয়ে গঠিত।

- ♦ যেকোনো ফুলের গর্ভপত্র প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত — গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুণ্ড।
- ♦ সবচেয়ে নীচে ছোটো ডিমের আকারের অংশটি হলো গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়।
- ♦ গর্ভাশয়ের মাথা থেকে সরু সুতোর মতো যে লম্বা অংশটি বেরোয় সেটি হলো গর্ভদণ্ড।
- ♦ এই গর্ভদণ্ডের মাথায় যে পাঁচটি ফুটকির মতো অংশ রয়েছে সেটি হলো গর্ভমুণ্ড।
- ♦ গর্ভাশয়ের ভেতরে ছোটো ছোটো দানার মতো অংশ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোকে বলে ডিম্বক।
- ♦ ফুলের সবকটা গর্ভকেশরকে একসঙ্গে বলে গর্ভকেশরচক্র।

জেনে রাখো : পরাগধানীর মধ্যে যে পরাগরেণু থাকে তা প্রথমে গর্ভমুণ্ডে পড়ে। তারপরে ডিম্বকের সঙ্গে মিলিত হলে ডিম্বাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।

পরাগযোগ

❖ কোনো ফুলের পরাগরেণু সেই ফুল বা অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে। এটাই হলো পরাগযোগ বা পরাগমিলন।

❖ কোনো ফুলের পরাগরেণু যখন ওই ফুলে অথবা একই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে বা স্থানান্তরিত হয় তখন ওই ঘটনাকে স্বপরাগযোগ (Self pollination) বলে।

❖ কোনো ফুলের পরাগরেণু যখন একইরকম অন্য উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে বা স্থানান্তরিত হয় তখন ওই ঘটনাকে ইতরপরাগযোগ (Cross pollination) বলে।

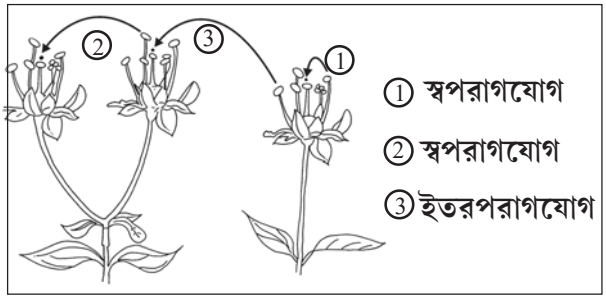

স্বপরাগী ফুল	ইতরপরাগী ফুল
চিনেবাদাম ফুল	কুমড়ো ফুল

ফল

তোমরা জেনেছো যে পরাগরেণু ডিম্বকের সঙ্গে মিলিত হলে ডিম্বাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।

এবারে একটা ফলের গঠন সম্বন্ধে জেনে নিই। আম একটা বোঁটাযুক্ত রসালো ফল। একটি ফুল থেকে একটি ফল গঠিত হয় বলে আম হলো একটি সরল ফল। পাশে দেওয়া আমের ছবিটা দেখো।

ফল

ফলত্বক

ডিম্বাশয়ের আবরণীত্বক থেকে ফলত্বক গঠিত হয়

- **বহিঃত্বক**: এটি পাতলা চামড়ার মতো। কাঁচা অবস্থায় এর রং সবুজ। পেকে গেলে ওই রং লাল, কমলা, হলদে হয়। এই ত্বককে ফলের খোসা বলে।
- **মধ্যত্বক**: এটি রসালো ও শাঁসযুক্ত। আমের এই অংশটাই আমরা খাই।
- **অন্তঃত্বক**: এটি কঠিন। একে আঁটি বলা হয়। এটি বীজকে ঢেকে রাখে।

বীজ

আমের বীজ দুটি বীজপত্র নিয়ে গঠিত

❖ **ফলের প্রকারভেদ**

ফল

- **সরল ফল**

একটা বোঁটা তার ওপরে একটামাত্র অংশ। আর তাতে একটা বীজ থাকে।

- **গুচ্ছিত ফল**

একটা বোঁটা, তার ওপরে অনেকগুলো অংশ। অংশগুলো আলাদা করা যায় আর প্রতিটা অংশে একটা করে বীজ থাকে।

- **যৌগিক ফল**

একটা বোঁটা, তার ওপরে অনেকগুলো অংশ। অংশগুলো আলাদা করা যায় না। প্রতিটা অংশে একটা করে বীজ থাকে।

বীজ

পরাগরেণু ডিম্বকের সঙ্গে মিলিত হলে ডিম্বাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।

মটর বীজে দুটি বীজপত্র থাকে। মটর বীজের অংশগুলো নীচে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো—

বীজ

- **বীজত্বক**
  - **বহিঃত্বক**
  - **অন্তঃত্বক**
- **অন্তর্বীজ বা ভ্রূণ**
  - **ভ্রূণমুকুল**
  - **বীজপত্রাধিকাণ্ড**
  - **পর্বসন্ধি**
  - **বীজপত্রাবকাণ্ড**
  - **ভ্রূণমূল**

মনে রাখা জরুরি :

- মূলের চারটি অংশ হলো — মূলত্র অঞ্চল, বর্ধনশীল অঞ্চল, মূলরোম অঞ্চল এবং স্থায়ী অঞ্চল।
- মূলের কাজ উদ্ভিদকে দৃঢ়ভাবে মাটির সঙ্গে আটকে রাখা এবং মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ শোষণ করা।
- কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ হলো — পর্ব, পর্বমধ্য, পাতা, কক্ষ, মুকুল, শাখাপ্রশাখা।
- কাণ্ডের কাজ হলো — মূলের মাধ্যমে শোষিত জল ও খনিজ লবণ পাতায় পৌঁছে দেওয়া এবং পাতায় উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়া।
- পাতার অংশগুলি হলো — পত্রমূল, পত্রবৃন্ত ও পত্রফলক।
- পাতার কাজ হলো — খাদ্য তৈরি করা, গ্যাসীয় পদার্থের আদানপ্রদান ও বাষ্পমোচনে সাহায্য করা।
- ফুল পুষ্পস্তবক, পুষ্পাক্ষ ও পুষ্পবৃন্ত নিয়ে গঠিত।
- ফল ফলত্বক ও বীজ নিয়ে গঠিত।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির 'পরিবেশের সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

ফুলের যে অংশটা ফলে পরিণত হয় সেটা হলো— (ক) বৃতি (খ) দলমণ্ডল (গ) পরাগধানী (ঘ) ডিম্বাশয়।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

২.১ একটি একক পত্রের উদাহরণ হলো _____।

২.২ সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায় _____ পাতায়।

২.৩ কচুরিপানার খর্বধাবক একটি রূপান্তরিত _____।

৩. **ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :**

৩.১ উদ্ভিদের কাণ্ডে স্থায়ী অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়।

৩.২ গাছের পাতার প্রসারিত ও চ্যাপ্টা অংশের নাম পত্রবৃন্ত।

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

একটি গুল্ম শ্রেণির উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করো।

৫. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

মূলের দুটি কাজ উল্লেখ করো।

৬. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

একটি আদর্শ মূলের চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো : (ক) মূলত্র (খ) মূলরোম অঞ্চল।

দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য

একটি আদর্শ মূলের যেকোনো তিনটি অংশের নাম লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ এমন একটি খাদ্য উপাদান যা থেকে শক্তি পাওয়া যায় **না** তা হলো — (ক) প্রোটিন (খ) কার্বোহাইড্রেট (গ) ভিটামিন (ঘ) লিপিড।

১.২ গয়টার হয় যে খাদ্য উপাদানের অভাবে তা হলো — (ক) সোডিয়াম (খ) আয়রন (গ) আয়োডিন (ঘ) ক্যালশিয়াম।

১.৩ কাণ্ডের যে জায়গা থেকে শাখা বেরোয় সেই জায়গাটা হলো— (ক) পর্ব (খ) কক্ষ (গ) পর্বমধ্য (ঘ) পত্রমূল।

১.৪ রূপান্তরিত মৃদগত কাণ্ড দেখা যায় যে গাছে সেটি হলো— (ক) বেল গাছ (খ) আম গাছ (গ) আলু গাছ (ঘ) নারকেল গাছ।

১.৫ ছোটো মাছ খেলে শরীর হাড় তৈরিতে অপরিহার্য একটি ধাতুর ফসফেট যৌগ পায়। ধাতুটি হলো —
(ক) সোডিয়াম (খ) লোহা (গ) ম্যাগনেসিয়াম (ঘ) ক্যালসিয়াম

১.৬ প্রোটিনের অণুতে কোন মৌলটির পরমাণু থাকতেই হবে —
(ক) ম্যাগনেশিয়াম (খ) পটাশিয়াম (গ) ক্যালশিয়াম(ঘ) নাইট্রোজেন

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ ভিটামিন D _____ দ্রাব্য।

২.২ পরাগধানীতে থাকে _____।

২.৩ আমের _____ অংশ আমরা খেয়ে থাকি।

২.৪ ক্ষারীয় দ্রবণে মিথাইল অরেঞ্জ দিলে দ্রবণের রং হবে _____।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ একটি খাদ্য থেকে একাধিক খাদ্য উপাদান পাওয়া যেতে পারে।

৩.২ উদ্ভিদের মূলে কোনো পর্ব নেই।

৩.৩ পাতা ও কাণ্ডের মাঝে যে কোণ তৈরি হয় তাকে কক্ষ বলা হয়।

৩.৪ আয়রন ট্যাবলেটে ধাতব আয়রন নেই, আছে তার যৌগ।

৩.৫ জলীয় দ্রবণে H^+ আয়ন মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না।

৩.৬ লাল লিটমাস কাগজ দিয়ে NaOH ও KOH দ্রবণের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না।

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৪.১ মানুষের দেহে আয়োডিনের একটি কাজ উল্লেখ করো।

৪.২ জলে দ্রবণীয় এমন একটি ভিটামিনের নাম উল্লেখ করো।

৪.৩ একটি গুল্ম শ্রেণির উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করো।

৪.৪ জবাপাতায় কী ধরনের শিরাবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়?

৪.৫ একটি খনিজ অ্যাসিডের নাম অথবা সংকেত লেখো।

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ ফাইটোকেমিক্যালস আছে এমন দুটি খাবারের নাম লেখো।

৫.২ স্বপরাগযোগ ও ইতরপরাগযোগের পার্থক্য লেখো।

৫.৩ জলকে প্রাথমিকভাবে প্রশম প্রকৃতির দ্রাবক বলার স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৫.৪ নীল লিটমাসের বর্ণ পরিবর্তন করা ছাড়া আর কোন পরীক্ষায় HCl ও HNO_3 দ্রবণের মিল পাওয়া যাবে?

৬. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ বিভিন্ন খাবারে উপস্থিত ফাইটোকেমিক্যালস আমাদের কীভাবে সাহায্য করে?

৬.২ পত্রফলকের কাজ কী কী?

৬.৩ কাণ্ডের দুটি কাজ উল্লেখ করো।

৬.৪ প্রাণীদেহে লিপিডের বিভিন্ন প্রকার কাজের কথা উল্লেখ করো।

৬.৫ জীবদেহে জলের দ্রাবক ধর্ম কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো।

পঠন সেতু

পরিবেশ ও ইতিহাস

সপ্তম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদনা ও বিন্যাস

মহঃ মাসুদ আখতার

বিষয় নির্মাণ

অর্পিতা ভাদুড়ি

ড. তন্ময় কুমার ঘোষ

সঞ্চিতা বর্মণ

সমরেন্দ্রনাথ সিনহা

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান	১-৩
২.	সভ্যতার বিকাশ	৪-৬
৩.	বৈদিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক	৭-৯
৪.	নব্যধর্ম আন্দোলন	১০-১৩
৫.	সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন	১৪-১৭
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ১	১৮-১৯
৬.	প্রাচীন ভারতে সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ	২০-২২
৭.	এক নজরে প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা	২৩-২৬
৮.	নগরায়ণ	২৭-৩১
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ২	৩২-৩৩
৯.	পশ্চিমবঙ্গের রূপরেখা	৩৪-৩৬
১০.	দিবস পালন	৩৭-৩৮
১১.	গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব	৩৯-৪১
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ৩	৪২-৪৩
	পঠন সেতুর বিষয় প্রসঙ্গে	৪৪

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান

১

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সাহিত্যিক উপাদানগুলির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

ইতিহাসের উপাদান বলতে আমরা বুঝি যে সমস্ত জিনিসের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন যুগের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। সময়ের বিন্যাস অনুযায়ী আমরা ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করে থাকি — প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান আমরা নিম্নে বর্ণিত ছকের সাহায্যে আলোচনা করব —

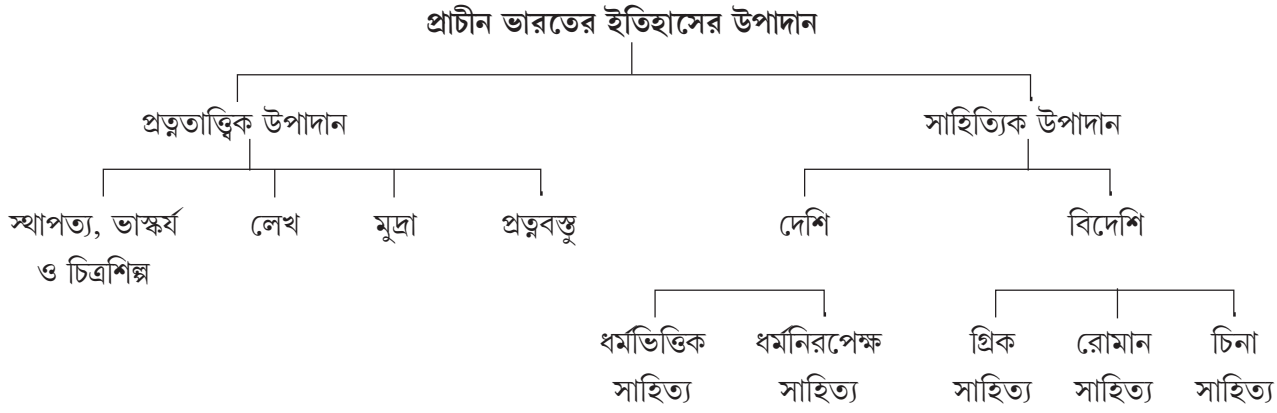

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান :

মুদ্রা : প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে মুদ্রা হল সবচাইতে সঠিক উপাদান। মুদ্রা থেকে শাসকের নাম, শাসনকালের সময়, সাম্রাজ্যসীমা, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্পসংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীন ভারতের মুদ্রাগুলি তামা, রুপো, সোনা প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্মিত হত। গুপ্তযুগে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা সেই যুগে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল বলে জানা যায়। গুপ্তযুগের মুদ্রায় দেবদেবী, বীণা বাদনরত মূর্তি প্রভৃতি থেকে সে যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

লিপি : প্রত্নতত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে লিপি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকালে পাথর বা ধাতুর পাতে লিপি খোদাই করে লেখা হত। মৌর্য সম্রাট অশোকের লেখগুলি লেখমালার শ্রেষ্ঠ নমুনা। আবার অনেক শাসকের গুণগানও লেখ হিসাবে খোদাই করা হত, যেগুলোকে বলে প্রশস্তি। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির নাসিক প্রশস্তি ইত্যাদি এর গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এই লিপিগুলির সাহায্যে রাজার রাজত্বকাল, সাম্রাজ্যের সীমানা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প : প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপাদানগুলি থেকে আমরা জানতে পারি—

- মাটি খুঁড়ে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শন থেকে তৎকালীন যুগের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়।
- সাঁচী, সারনাথের স্তূপ, অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র ও গুপ্তযুগের ভিতরগাঁও মন্দিরগুলি তৎকালীন শিল্প, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ইতিহাসে জানতে পারি।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ছাড়াও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেকরকম সাহিত্য উপাদান পাওয়া যায়। সেগুলোকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।— (১) দেশীয় সাহিত্য ও (২) বৈদেশিক সাহিত্য।

দেশীয় সাহিত্য : দেশীয় সাহিত্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়— (১) ধর্মীয় সাহিত্য ও (২) ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য।

ধর্মীয় সাহিত্য :

(ক) বৈদিক সাহিত্য : বৈদিক সাহিত্যকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব-এই চারটি হলো সংহিতা। এগুলি থেকে তৎকালীন যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়।

(খ) মহাকাব্য : ভারতের দুটি মহাকাব্য হল রামায়ণ ও মহাভারত। এই মহাকাব্য দুটি থেকে প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানতে পারি।

(গ) পুরাণ : পুরোনো কাহিনী হল পুরান, এগুলি মূলত ধর্মনির্ভর সাহিত্য। মোট পুরাণের সংখ্যা ১৮টি। এগুলি থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বিষয় জানতে পারি।

(ঘ) বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য : জৈন গ্রন্থ— অঙ্গুত্তরনিকায়, ভগবতীসূত্র, কল্পসূত্র। বৌদ্ধ গ্রন্থ— দীপবংশ, মহাবংশ ও জাতকের কাহিনি থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি।

ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য : প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা বই থেকে জানতে পারি —

(ক) জীবনচরিত : জীবনচরিত ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', বিলহনের বিক্রমাঙ্কদেব চরিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য জীবনচরিতের উদাহরণ।

(খ) আঞ্চলিক ইতিহাস : আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ থেকে কাশ্মীরের ইতিহাস জানা যায়।

(গ) অন্যান্য গ্রন্থ : কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যেগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে নানান তথ্য জানা যায়।

বিদেশি সাহিত্য : বিদেশি পর্যটক ও লেখকদের বিবরণ থেকেও ভারতের ইতিহাসের বহুমূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশ থেকে (গ্রিক, চিন) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যটক এসেছেন ও তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

(ক) গ্রিক বিবরণ : গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' থেকে মৌর্যযুগের ইতিহাস জানা যায়। এছাড়া এক অজ্ঞাতনামা গ্রিক লেখকের 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থ থেকে ভারতের সমুদ্রবাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায়।

(খ) চিনা বিবরণ : চিনা পর্যটক ফাসিয়ান গুপ্তযুগে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর লেখা 'ফো-কুয়ো-কি' থেকে বিভিন্ন বিষয় জানা যায়। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আসেন সুয়ান জাং। তাঁর লেখা গ্রন্থটি 'সি-ইউ-কি'।

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা মধ্যযুগের ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান সম্পর্কে জানবে। বিভিন্ন শাসকদের আমলে তাদের রাজকবি, লেখক, ঐতিহাসিক, বিদেশী ভ্রমণকারী অথবা রাজার নিজের লেখা থেকেও সমকালিন যুগের সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। তোমরা বিদেশী ভ্রমণকারী সুয়ান জাং, ইবন বতুতা প্রমুখের বিবরণ সম্পর্কে জানবে। সন্ধ্যাকর নন্দী, জয়দেব প্রমুখের লেখায় পৃষ্ঠপোষক শাসকের কৃতিত্বের পরিচয় পাবে। বল্লালসেন, কৃষ্ণদেব রায় প্রমুখ শাসকেরা সাহিত্যকীর্তির যে সাক্ষর রেখেছিলেন, সে সম্পর্কে জানবে।

মনে রাখা জরুরি :

- সময়ের বিন্যাস অনুযায়ী ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়—প্রাচীন যুগের ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস ও আধুনিক যুগের ইতিহাস।
- প্রাচীন ভারতের মুদ্রাগুলি তামা, রুপো, সোনা প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্মিত হত।
- গুপ্তযুগের মুদ্রায় দেবদেবি, বিণাবাদনরত মূর্তি প্রভৃতি থেকে সে যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়।
- শাসকের গুনগান লেখা লেখগুলিকে প্রশস্তি বলে।
- কলহনের রাজতরঙ্গিনি একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক গ্রন্থ।

নমুনা প্রশ্ন

১. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) ভারতের দুটি মহাকাব্য কী কী?

(খ) ‘রামচরিত’ কার লেখা?

(গ) কলহনের রাজতরঙ্গিনি থেকে কোন অঞ্চলের ইতিহাস জানা যায়?

২. ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো :

(ক) মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা থেকে গুপ্তযুগের ইতিহাস জানা যায়।

(খ) ‘পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি’ নামক গ্রন্থ থেকে ভারতের সমুদ্র বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায়।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর _____ প্রশস্তি থেকে তাঁর পরিচয় ও কীর্তি কাহিনী জানা যায়।

(খ) আইহোল প্রশস্তি ছিল চালুক্যরাজ _____।

(গ) কৌটিল্যের _____ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

(ঘ) সুয়ান জাং এর লেখা গ্রন্থটি হল _____।

সভ্যতার বিকাশ

২

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- সভ্যতা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মেহেরগড় সভ্যতা ও হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

সংস্কৃতি থেকে সভ্যতা আলাদা। ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগে স্থায়ী বসতি দেখা গেল। তার সঙ্গে ধীরে ধীরে সভ্যতার নানা বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠলো মানুষের জীবনযাত্রায়। আদিম মানুষের ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের দিকে যেতে থাকল।

সভ্যতা হতে গেলে কতগুলো বিষয় থাকতে হবে। গ্রাম ও নগর থাকতে হবে। শাসনব্যবস্থা থাকতে হবে। শিল্প ও স্থাপত্যের নমুনা সভ্যতার একটা বড়ো দিক। আর অবশ্যই লিপির ব্যবহার জানতে হবে সভ্য মানুষকে। লিপিমালার ব্যবহারই সভ্যতার সবথেকে বড়ো মাপকাঠি। সভ্যতা বলতে একদিকে জীবনযাপনের উন্নতি বোঝানো হয়। ধরো, যখন লিখতে শিখল মানুষ বা গুহার বদলে বানাতে শিখল পাকা বাড়ি। আবার পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার শিখল। এইসবই এক একটা উন্নতির চিহ্ন। এগুলো সবই সভ্যতার নানা দিক। আর এক একটা ভৌগোলিক অঞ্চলকে ঘিরে একেকটা সভ্যতা গড়ে উঠে। তাই মেহেরগড় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা এসব নামকরণ হয়েছে।

মেহেরগড় :

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে মেহেরগড়ে তামা-পাথরের যুগের একটি প্রত্নকেন্দ্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। মেহেরগড় বোলান গিরিপথের থেকে খানিক দূরে অবস্থিত। সেখানে মূলত একটি কৃষিনির্ভর সভ্যতার নজির পাওয়া যায়। সময়টা ছিল ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ। ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক জাঁ ফ্রাঁসোয়া জারিজ মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন রিচার্ড মেডো।

খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ পর্যন্ত মেহেরগড়ের সবথেকে পুরোনো পর্যায় ছিল বলে অনুমান করা যায়। ঐ পর্যায়ে সেখানকার মানুষ গম ও যব ফলাতে জানত। ছাগল, ভেড়া ও কুঁজওলা ষাঁড় ছিল তাদের গৃহপালিত পশু। পাথরের তৈরি জাঁতা ও শস্য পেষার যন্ত্র মেহেরগড়ে পাওয়া গেছে।

মেহেরগড়ের মাটির বাড়িগুলিতে রোদে পোড়ানো ইটের ব্যবহারও দেখা যায়। বাড়িগুলিতে একের বেশি ঘর থাকত। কয়েকটি ইমারত সাধারণ বাড়ির থেকে অনেক বড়ো। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন সেগুলিতে শস্য মজুত রাখা হতো।

মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব ধরা হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ পর্যন্ত। গম ও যবের পাশাপাশি এই পর্বে কার্পাস চাষেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও অবধি পৃথিবীতে সবথেকে পুরোনো কার্পাস চাষের নমুনা মেহেরগড়েই পাওয়া গেছে। মেহেরগড়ে পাওয়া পাথরের কাস্তে ভারতীয় উপমহাদেশে কাস্তে ব্যবহারের সব থেকে পুরোনো নজির। এই পর্যায়ে মেহেরগড়ে মাটির পাত্র তৈরি হতো।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০ অব্দ পর্যন্ত মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্ব ধরা হয়। এই সময় নানারকম গম এবং যব চাষ করা হতো। কুমোরের চাকায় মাটির পাত্র বানানোর কৌশল এই পর্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাত্রগুলি চুল্লিতে পুড়িয়ে সেগুলির গায়ে নানারকম নকশা ও ছবি আঁকা হতো। সেখানে একরঙা, দুইরঙা ও বহুরঙা মাটির পাত্র পাওয়া গেছে।

বসতি হিসেবেও মেহেরগড়ের আয়তন বেড়েছিল। এই পর্যায়ে নিয়মিত ভাবে তামার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তবে আকরিক থেকে ব্যবহারের জন্য তামা বার করা সহজ ছিল না। ফলে পাথরের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহারও জারি ছিল। এই সময়ে মেহেরগড়ে সিলমোহরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সব মিলিয়ে গ্রামীণ কৃষিসমাজ আরও জটিল রূপ নিচ্ছিল। মেহেরগড়ে সেই বদলের চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়। সেই বদলের চিহ্নগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল হরপ্পা সভ্যতায়।

হরপ্পা :

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মহেনজোদাড়ো কেন্দ্র দুটি আবিষ্কার করা হয়। ঐ দুটি কেন্দ্রই সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত। তাই শুরুতে এই সভ্যতার নাম হয়েছিল *সিন্ধু সভ্যতা*। কিন্তু পরে সিন্ধু উপত্যকার বাইরেও এই সভ্যতার অনেক কেন্দ্রের খোঁজ মিলেছে। সেই সবকটা কেন্দ্রকেই সিন্ধু উপত্যকার কেন্দ্র বলার যুক্তি নেই। ফলে হরপ্পার নামেই ওই সভ্যতার নাম হয় *হরপ্পা সভ্যতা*। কারণ সেখানেই ঐ সভ্যতার প্রথম কেন্দ্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাছাড়া হরপ্পা ছিল ওই সভ্যতার সবথেকে বড়ো কেন্দ্র।

হরপ্পা সভ্যতা প্রায়-ইতিহাস যুগের সভ্যতা। কারণ হরপ্পার লোকেরা লিখতে জানত । কিন্তু, সেই লেখা আজও পড়া যায়নি। তাই প্রত্নবস্তুর উপর ভিত্তি করেই হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস জানতে হয়। এই সভ্যতার মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার জানত। সেজন্য **একে তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাও বলা হয়**। তামা-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাগুলির মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাই সবথেকে বড়ো। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার উন্নতির সময়। তবে মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতার সময়কাল ধরা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম নগর গড়ে উঠেছিল। তাই একে *প্রথম নগরায়ণ* বলা হয়। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পা ছিল সবচেয়ে বড়ো দুটো নগর।

নগরের বাইরে গ্রামীণ এলাকায় থাকত কৃষিজীবী মানুষ। নগরে সরাসরি খাদ্য উৎপাদন হতো না। খাদ্যশস্যের জন্য নগরবাসীদের গ্রামের ওপরেই নির্ভর করতে হতো। গ্রামে নানারকম ফসলের চাষ হতো। যেমন, গম, যব, জোয়ার, বাজরা, নানারকম ডাল, সরষে এবং ধান। তবে ধানের ফলন সব জায়গায় হতো না। শুধু গুজরাটের রংপুর ও লোথালেই ধানের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাছাড়া তুলো, তিল প্রভৃতি ফসলেরও চাষ হতো। রাজস্থানের কালিবঙ্গানে একটি ক্ষেতে কাঠের লাঙলের ফলার দাগও পাওয়া গেছে।

কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল পশুপালন। হরপ্পার মানুষ গৃহপালিত পশুর ব্যবহার জানত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গবাদি পশু। ষাঁড়, ভেড়া ও ছাগলের ব্যবহার হতো। উটের ব্যবহারও হরপ্পার লোকেরা জানত। তবে ঘোড়ার ব্যবহার হরপ্পার মানুষ জানত না। এছাড়াও ছিল ঘুরে বেড়ানো পশুপালক গোষ্ঠী। এইসব মিলিয়ে হরপ্পা সভ্যতার সমাজ গড়ে উঠেছিল।

মূর্তি গুলি দেখে হরপ্পার মানুষদের পোশাক, গয়না ও সাজগোজ সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। তারা সূতি ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। হরপ্পা সভ্যতার নানা জায়গায় অনেক সোনা, রুপো, তামা ও হাতির দাঁতের গয়না পাওয়া গেছে।

বিশাল ও বৈচিত্র্যময় হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০অব্দের পরে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। অথচ হঠাৎ করে একটি সভ্যতা শেষও হয়ে যায় না। বেশ কিছু ঘটনার যোগফলে হরপ্পা সভ্যতার অবনতি হয়েছিল।

মনে রাখা জরুরি :

- মানুষের জীবনযাত্রায় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল।
- মেহেরগড় তামা-পাথরের যুগের সভ্যতা।
- হরপ্পা প্রায় ইতিহাস যুগের সভ্যতা।
- হরপ্পা সভ্যতায় প্রথম নগরের বিকাশ লক্ষ করা গিয়েছিল।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে লেখো (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) মেহেরগড় সভ্যতাটি কোন্ যুগের সভ্যতা?

(খ) মেহেরগড় সভ্যতা কারা আবিষ্কার করেছিলেন?

(গ) হরপ্পা সভ্যতার সবচেয়ে বড় দুটি নগরের নাম লেখো।

(ঘ) হরপ্পার মানুষের জীবিকা কী ছিল?

২. ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো :

(ক) হরপ্পা সভ্যতা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা।

(খ) মেহেরগড় সভ্যতাটি ভারতবর্ষের রাজস্থানে অবস্থিত।

(গ) মেহেরগড় সভ্যতায় সব থেকে পুরোনো কার্পাস চাষের নমুনা পাওয়া গেছে।

(ঘ) হরপ্পা সভ্যতায় সোনা, রুপোর সন্ধান পাওয়া গেছে।

বৈদিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক

৩

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ইন্দো-আর্যদের জীবনযাত্রার নানান গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।
- আদি বৈদিক মানুষের বাসস্থান ও পরবর্তী বৈদিক মানুষের বাসস্থান পরিবর্তনের ফলাফল হিসেবে কৃষির উত্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৈদিক রাজনীতিতে রাজার উত্থান কিভাবে আর কেন হল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

মানুষের পরিবারের মত ভাষারও পরিবার থাকে; আর সেই একই পরিবারের ভাষাগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেশকিছু মিলও থাকে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের এক সদস্য হলো ইন্দো-ইরাণীয় ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠী। এদের যে শাখা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিল, তাদের ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী বলা হয়। বৈদিক সাহিত্য থেকেই এই ইন্দো-আর্যদের বসতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়; তাই ইন্দো-আর্যদের এই সভ্যতার নাম বৈদিক সভ্যতা। বৈদিক সভ্যতা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের এই সভ্যতার নানান গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

বৈদিক সাহিত্য :

বেদ এসেছে বিদ শব্দ থেকে, যার অর্থ জ্ঞান। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যকে চারভাগে ভাগ করা হয়— সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব — এই চারটি হল সংহিতা, আর সংহিতাগুলি ছন্দে বাঁধা কবিতা। সবচেয়ে পুরোনো বৈদিক সংহিতা হল ঋক বেদ। বাকি তিনটি সংহিতা ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য ঋকবেদের পরের রচনা বলে, সেগুলিকে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য বলা হয়। অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের দুটি ভাগ — আদি বৈদিক সাহিত্য ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য। আর তাই বৈদিক যুগেরও ভাগ দুটি — আদি বৈদিক যুগ ও পরবর্তী বৈদিক যুগ। মোটামুটিভাবে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল ধরে নিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ অব্দকে আদি বৈদিক যুগ ও তারপর থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কে পরবর্তী বৈদিক যুগ বলা হয়।

বেদের ভূগোল :

ঋকবেদের ভূগোল থেকে আন্দাজ করা যায় সিন্ধু ও তার পূর্ব দিকের উপনদীগুলি দিয়ে ঘেরা অঞ্চলই ছিল আদি বৈদিক মানুষের বাসস্থান — যাকে সপ্তসিন্ধু অঞ্চল বলা হয়। আর পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনা থেকে জানা যায় এই সময়ের বৈদিক বসতি গড়ে উঠেছিল মূলতঃ সিন্ধু ও গঙ্গার মাঝের এলাকাকে কেন্দ্র করে। গঙ্গা উপত্যকার উত্তর ভাগ ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে বৈদিক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ায় বৈদিক সমাজে কৃষির প্রচলন হয়।

বৈদিকযুগ ও প্রত্নতত্ত্ব :

বৈদিক সাহিত্যে তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহারের কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। শেষদিকের রচনায় লোহার ব্যবহারের ধারণাও পাওয়া যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে ধূসর রঙের মাটির পাত্রের অস্তিত্বও পাওয়া যায়, যাদের গায়ে ছবিও আঁকা থাকতো। হরিয়ানার ভগবানপুরায় এরকম অনেক 'চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্র' পাওয়া গেছে।

বৈদিক রাজনীতি :

ঋকবেদে রাজা শব্দের আক্ষরিক অর্থ ছিল নেতা। রাজাকে কখনো 'বিশপতি' অর্থাৎ বিশ বা গোষ্ঠীর প্রধান যেমন বলা হয়েছে, তেমনি 'গোপতি' বা গবাদি পশুর প্রভু বলেও অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজা, শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভূপতি (ভু অর্থাৎ জমির পতি/মালিক) ও মহীপতি (পৃথিবীর রাজা)। রাজা যে এলাকাটি শাসন করতেন, তাকেই রাজ্য এবং যাদের শাসন করতেন তাদের প্রজা বলা হতো। বৈদিক রাজনীতিতে 'রত্নিন' (পরবর্তী সময়ের মন্ত্রী) ও 'সভা-সমিতি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বৈদিক অর্থনীতি :

ঋকবেদে কৃষির তুলনায় পশুপালনের কথাই বেশি পাওয়া যায় এবং গবাদি পশুকেই প্রধান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হত। ঋকবেদে কাঠের কারিগরি শিল্প, চামড়া শিল্প ও বয়নশিল্পের কথা জানা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষিকাজের সুবিধার্থে লোহার ব্যবহার, গয়না ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কথা জানা যায়। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের, নিষ্ক, শতমানের (মুদ্রার মতো ব্যবহার হতো) ব্যবহারের কথা জানা যায়।

বৈদিক সমাজ :

বৈদিক সাহিত্য থেকে বৈদিক সমাজে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। ঋকবেদের গোড়ার দিকে না থাকলেও পরবর্তী বৈদিক যুগে চতুর্বর্ণ প্রথার (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) অস্তিত্ব, জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করে। আদি বৈদিক যুগে সমাজে নারীর অবস্থান উঁচুতে থাকলেও পরবর্তীতে তার অবনতি ঘটে। পরবর্তী বৈদিক যুগে চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক যুগের শিক্ষা :

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন গুরু। গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভের কথা জানা যায়। গুরুর বুঝিয়ে দেয়া অংশ আবৃত্তাকারে মনে রাখতে হতো ছাত্রদের। বেদপাঠ, গণিত, ব্যাকরণ ও ভাষাশিক্ষার পাশাপাশি ব্রাহ্মণ ছাত্ররা অস্ত্রচালনা ও মেয়েরা নাচ ও গানের চর্চা করতো।

মনে রাখা জরুরি :

- আর্য কোন জাতিবাচক শব্দ নয়; এটি একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম।
- বৈদিক সাহিত্যকে চার ভাগে ভাগ করা হয় — সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।
- আদি বৈদিক মানুষেরা বসবাস করতো সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে।
- পরবর্তী বৈদিক যুগে চতুর্বর্ণ প্রথা ও চতুরাশ্রমের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) বিদ শব্দের অর্থ হলো _____ ।

(খ) আদি বৈদিক মানুষের বাসস্থান ছিল _____ অঞ্চল।

(গ) পরবর্তী বৈদিক যুগের মাটির পাত্রকে _____ বলা হতো।

(ঘ) ভূপতি শব্দের অর্থ _____ ।

২. **অতি সংক্ষেপে (একটি-দুটি বাক্যে) :**

(ক) সংহিতা বলতে কী বোঝো?

(খ) পরবর্তী বৈদিক যুগে বসতি মূলত কোন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল?

(গ) বৈদিক রাজনীতিতে রাজার ভূমিকা কী ছিল?

(ঘ) বৈদিক অর্থনীতি থেকে কোন কোন পেশার কথা জানতে পারা যায়?

(ঙ) চতুর্বর্ণ প্রথা কী?

(চ) বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিলো?

নব্যধর্ম আন্দোলন

৪

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সংগঠিত নব্য বঙ্গ আন্দোলন উত্থানের কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নব্যধর্ম আন্দোলনের মূল উপজীব্য বিষয়গুলি বর্ণনা করতে পারবে।
- জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ প্রচলিত বৈদিক ধর্ম অনেকটাই প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মমতকে বিলুপ্ত করে এক নতুন ধর্মীয় পথের সন্ধান দিতে প্রয়াসী হয়ে ওঠে কয়েকটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। আসলে এই সময় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বদলাতে শুরু করে। কৃষি হয়ে ওঠে বেশিরভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা, লোহার লাঙলের ব্যবহার বাড়ায় ফসলের উৎপাদনও খুব বেড়ে যায়। পাশাপাশি যে সমস্ত নতুন নগর এই সময় গড়ে ওঠে, তাদের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশই ছিল ব্যবসায়ী ও কারিগর — আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী ছিল।

যজ্ঞ, পশুবলি ও যুদ্ধের ফলে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নানান ক্ষতি হত। চাষের কাজে গবাদি পশুর প্রয়োজন হত বলে যজ্ঞে পশুবলি দেয়া কৃষকদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। বিভিন্ন জনপদ ও উপজাতিদের মধ্যে লড়াই ব্যবসার ক্ষতি করছিল যা ব্যবসায়ীরা মোটেই মেনে নিতে পারছিল না। এছাড়াও ধর্মের নামে আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান অসম্ভব বেড়ে যাওয়ার ফলে তা সাধারণ মানুষের পক্ষে পালন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রথমে কাজের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক শ্রেণিবিভাগ যখন বৈদিক ধর্মমতের প্রভাবে প্রবল জাতিভেদ প্রথায় পর্যবসিত হয়, স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ তাতে ক্ষুব্ধ হয় ও বৈদিক ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এছাড়াও বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমুদ্রযাত্রা, পয়সার লেনদেন ও সুদে টাকা খাটানো ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নিন্দার বিষয় হওয়ায় ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিলেও ক্ষত্রিয়রা সমাজে ব্রাহ্মণদের সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করতো না — তাদের অবস্থান ছিল বৈদিক সমাজে দ্বিতীয় স্থানে। ক্ষমতাশীল ক্ষত্রিয়রাও স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণদের সমান ক্ষমতা দাবি করতে থাকে। আর এভাবেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছিল ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বদলে নতুন সহজ-সরল ধর্মের খোঁজ করা শুরু করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বেদের বিরোধিতা করে ধর্ম সম্পর্কে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল যেসব ধর্মমত — সেগুলিকেই নব্যধর্ম (নতুন ধর্ম) বলা হয়। আর এই নতুন ধর্মমতের মধ্যে প্রধান দুটি ছিল — জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম।

(ক) জৈনধর্ম : নতুন তৈরি হওয়া ধর্মমতগুলির মধ্যে জৈনধর্ম ছিল প্রধান। এই ধর্মের প্রধান প্রচারকদের বলা হত তীর্থঙ্কর। জৈন ধর্ম অনুযায়ী মোট চব্বিশজন তীর্থঙ্করের অস্তিত্ব থাকলেও শেষ দুজন অর্থাৎ পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্মমতকে বেশি জনপ্রিয় করে তোলেন। জৈনধর্মে পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত 'চতুর্যামব্রত'-কে অবশ্যই মানতে হত — (ক) কোনো প্রাণী হত্যা না করা (খ) মিথ্যা কথা না বলা (গ) অন্যের জিনিস ছিনিয়ে না নেওয়া (ঘ) নিজের জন্য কোনো সম্পত্তি না করা। মহাবীর এর সঙ্গে 'ব্রহ্মচর্য' নীতিকেও যোগ করলে তা 'পঞ্চমহাব্রত' নামে পরিচিত হয়। সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান ও সৎ আচরণের ওপর জৈনরা জোর দিতেন, যাকে জৈনধর্মে ত্রিরত্ন বলা হয়। মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈন সন্ন্যাসীরা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় — দিগম্বর (যাঁরা কোনো বস্ত্র পরিধান করতেন না) ও শ্বেতাম্বর (যাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন)। জৈন ধর্মের মূল উপদেশগুলি বারোটি ভাগে সাজানো হয়েছিল, যাদের দ্বাদশ অঙ্গ বলা হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্বতার বদলে সহজসরল ধর্মের উত্থানের ক্ষেত্রে জৈনধর্মের নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

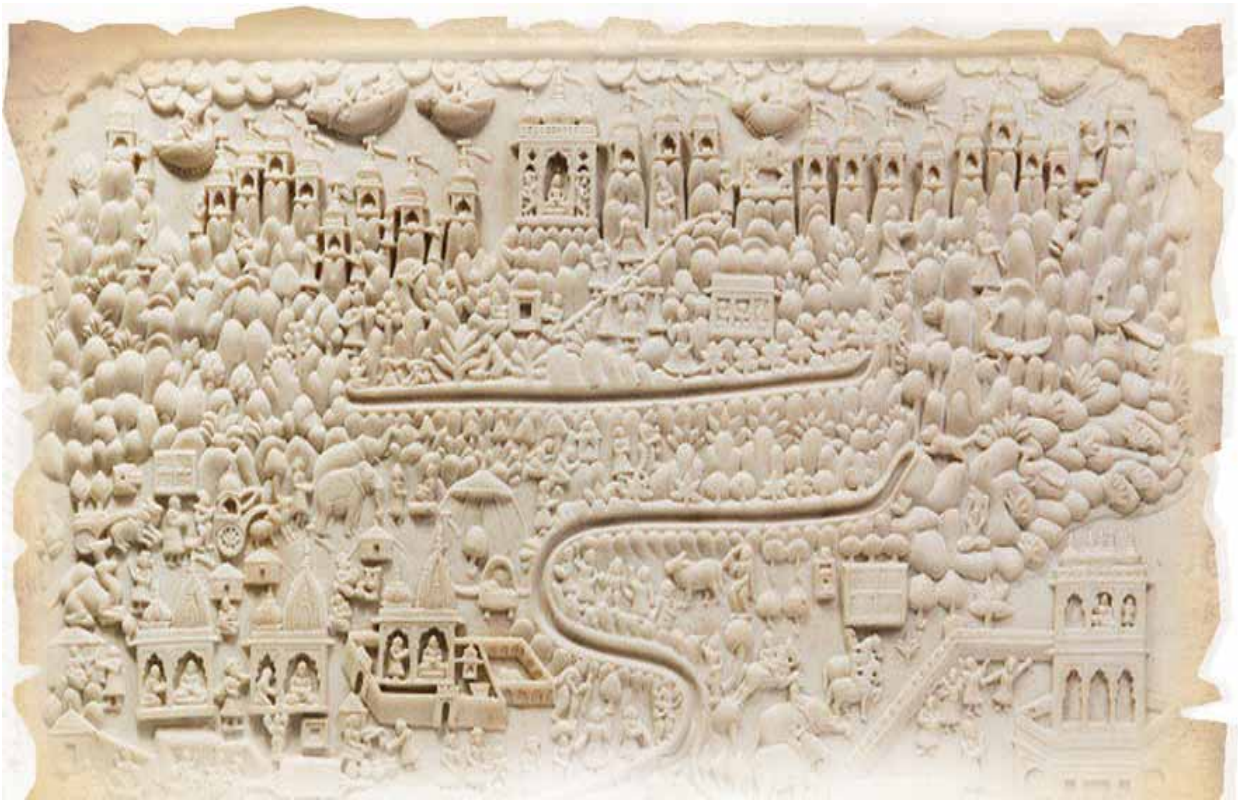

ছবি :
সামেত-শিখর, জৈনদের পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র। মনে করা হয় ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জন এই শিখরেই নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

(খ) বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ, যিনি নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুর ক্ষত্রিয় বংশে (শাক্য) জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ছ-বছরের তপস্যার পর বোধি বা জ্ঞান লাভ করে ক্ষত্রিয় পরিবারের সিদ্ধার্থ বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। বোধিবৃক্ষের নীচে বোধি বা জ্ঞান লাভ করার পর তিনি তাঁর উপদেশ সারনাথে তাঁর পাঁচজন সঙ্গীর মধ্যে প্রচার করেন— যা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে পরিচিত। গৌতম বুদ্ধ দুঃখের হাত থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোকেই তাঁর ধর্মদর্শনের মূল কথা বলে বর্ণনা করেছেন। চতুরার্য সত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে যে মানুষ দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি ও নির্বাণ লাভ করবে— তা বুদ্ধদেব সহজসরল ভাষায় প্রচার করেন। নির্বাণ বা মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে কঠোর তপস্যা বা চূড়ান্ত ভোগবিলাস নয়, মধ্যপন্থা অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মের নানাবিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য চারটি বৌদ্ধ ধর্মসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মহাযান ও হীনযান— এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান গ্রন্থ হল ত্রিপিটক (সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্ম্মাপিটক)। বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

← ছবি
বুদ্ধপদ (গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ), পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য, অমরাবতী। পায়ের ছাপের মাঝে ধর্মচক্র রয়েছে।

মনে রাখা জরুরি :

- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদ করে নব্যধর্ম আন্দোলনের সূচনা হয়।
- নতুন ধর্মমতগুলির মধ্যে প্রধান দুটি ধর্মমত ছিল জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম।
- জৈনধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল পঞ্চমহাব্রত ও ত্রিরত্ন।
- বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল চতুরার্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও মধ্যপন্থা।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) নব্যধর্ম আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল _____ খ্রিস্টাব্দে।

(খ) গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন _____ বংশে।

(গ) চতুর্যামব্রত ছিল _____ ধর্মের অংশ।

(ঘ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছিল _____ ধর্মের অন্তর্গত।

২. **নীচের বাক্যগুলির কোন্‌টি ঠিক কোন্‌টি ভুল লেখো :**

(ক) বৈদিক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই নব্যধর্ম আন্দোলনের সূচনা হয়।

(খ) জৈন ধর্ম অনুযায়ী মোট চোদ্দজন তীর্থঙ্কর-এর অস্তিত্ব ছিল।

(গ) গৌতম বুদ্ধ ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান ছিলেন।

(ঘ) ত্রিপিটক হল জৈন ধর্মগ্রন্থ।

৩. **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন-চার লাইন) :**

(ক) নব্যধর্ম আন্দোলন বলতে কী বোঝো?

(খ) চতুর্যামব্রত ও পঞ্চমহাব্রত কী?

(গ) বৌদ্ধধর্মমতের মূল বক্তব্যগুলি কী ছিল?

(ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সমাজের কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণির মানুষ কেন নব্যধর্ম আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন? যুক্তিসহ লেখো।

সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন

৫

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- সম্রাট ও সাম্রাজ্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও তাদের উল্লেখযোগ্য শাসকদের নামের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- বিভিন্ন রাজাদের উল্লেখযোগ্য কাজের বর্ণনা করতে পারবে।

সাম্রাজ্য বলতে একটি বিরাট অঞ্চলকে বোঝায়। অনেকগুলো রাজ্য মিলে একটি বড়ো শাসন এলাকা হয়। এই বড়ো শাসন এলাকাই সাম্রাজ্য। একটি সাম্রাজ্যে অনেক জনগণ বাস করে।

যিনি সাম্রাজ্য শাসন করেন, তিনিই সম্রাট। সম্রাট মানে বড়ো রাজা। যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। একজন রাজা যুদ্ধের মাধ্যমে অন্য রাজ্যকে দখল করে নিজের রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করত।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে ষোলোটি মহাজনদের কথা জানা যায়। এগুলিকে ষোড়শ মহাজনপদ বলা হয়। এই মহাজনপদগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে মগধ। মগধ প্রথমে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়।

নীচে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের বেশকিছু প্রাচীন সাম্রাজ্য সম্পর্কে জানব।

মৌর্য শাসন

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বে ৩২৪ অব্দ নাগাদ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি চাণক্য নামে এক পণ্ডিতের সাহায্যে নন্দ বংশের শেষ শাসক ধননন্দকে পরাজিত করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যই প্রথম সাম্রাজ্য।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছেলে বিন্দুসারের আমলে সাম্রাজ্যের সীমা বিশেষ বাড়েনি। বিন্দুসারের ছেলে অশোক। অশোকের সময় কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বহু মানুষ মারা যায়। অশোক এর পর হিংসা ত্যাগ করেন ও যুদ্ধ বন্ধ করে দেন।

খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ নাগাদ শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ।

মৌর্য শাসনব্যবস্থায় সম্রাটই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অনেক রাজকর্মচারী সম্রাটকে শাসনকার্যে সহায়তা করত। তাদের মধ্যে ছিল অমাত্য, মহামাত্র প্রভৃতি। মৌর্য সম্রাটদের বিরাট সেনাবাহিনী ছিল। এই সেনাবাহিনীতে হাতি, ঘোড়া, রথ, নৌকা প্রভৃতি ছিল। এমনকি গুপ্তচর ব্যবস্থাও ছিল। মৌর্য সম্রাটরা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করত। মৌর্য সাম্রাজ্য শুধু কর্মচারী, সেনা, গুপ্তচরদের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল না। সম্রাট অশোক তাঁর ধম্মনীতি বা ধর্মনীতি দিয়ে জনগণকে একজোট করার চেষ্টা করেন।

কুষাণ শাসন

কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কৃতিত্ব কুজুল কদফিসেস-এর তারপর রাজা হল বিম কদফিসেস। বিমের ছেলে প্রঞ্চম কণিষ্ক কুষাণদের সেরা রাজা।

কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। এই বছর থেকেই শকাব্দ গণনা শুরু হয়। কনিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। তবে কুষাণদের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল ব্যাকট্রিয়া।

কণিষ্কের পর বাসিষ্ক ও হুবিষ্ক শাসক হন। তারপর আস্তে আস্তে কুষাণ শাসনের অবনতি ঘটে।

কুষাণ রাজারা নিজেদের দেবপুত্র বলে ঘোষণা করতেন। কুষাণ শাসনে লক্ষ করার মতো বিষয় হলো দুজনে মিলে রাজ্যপাঠ চালানো। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় বাবা ও ছেলে একসঙ্গে শাসন কাজ চালাতেন। শাসনব্যবস্থার সুবিধের জন্য সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হত কতগুলি প্রদেশে।

সাতবাহন শাসন

সাতবাহনরা দক্ষিণভারতে শাসন করত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্রী সাতকর্ণী। 'নাসিক লেখ' ও 'কার্লে লেখ' থেকে তাঁর রাজ্যবিস্তারের কথা জানা যায়। শক-ক্ষত্রপ গোষ্ঠীর নেতা রুদ্রদামনের সাথে সাতবাহনদের লড়াই বেধেছিল—জুনাগড় লিপি থেকে জানা যায়।

সাতবাহন শাসন ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন প্রধান। তিনি আবার সেনাবাহিনীরও প্রধান ছিলেন। সাতবাহন শাসকেরা শাসনের সুবিধের জন্য সাম্রাজ্যকে ছোটো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন।

গুপ্ত শাসন

শ্রীগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীগুপ্তের পর তাঁর পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শাসন পরিচালনা করেন। প্রথম চন্দ্রপুপ্তের শাসনের শুরু থেকে গুপ্তাব্দ গোনা শুরু হয়। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েছিলেন। উত্তর ভারতের নয়জন রাজা ও দক্ষিণ ভারতের বারো জন রাজাকে হারিয়ে দেন তিনি। সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি শকদের পরাজিত করেছিলেন বলে 'শকারি' উপাধি লাভ করেন। তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত ছিলেন পরবর্তী সম্রাট। তাঁর সময়েই নালন্দা মহাবিহার স্থাপিত হয়। প্রথম কুমারগুপ্তের পর তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হন। তাঁর সময়ে হুনরা গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি এই আক্রমণ প্রতিহত করেন।

গুপ্ত শাসন কাঠামোয় সম্রাটই ছিলেন প্রধান। বিরাট ক্ষমতা বোঝানোর জন্য তারা বড়ো বড়ো উপাধি নিতেন। গুপ্ত সম্রাটরা অনেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখানোর বড় বড় যজ্ঞ করেছিলেন। সম্রাটকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন রাজকর্মচারীরা। শাসন কাজের সুবিধার জন্য শাসকেরাও সাম্রাজ্যকে কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন।

পুষ্যভূতি বংশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য ছিল পুষ্যভূতি বংশ। পুষ্যভূতিরা থানেশ্বরে রাজ্য গড়ে তোলেন। প্রভাকরবর্ধন ছিলেন এই বংশের প্রথম শক্তশালী রাজা। হর্ষবর্ধন ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তাঁর সিংহাসনে বসার বছর থেকেই 'হর্ষাব্দ' গোনা শুরু হয়। হর্ষবর্ধন অনেকগুলি রাজশক্তির সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

তিনি গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন — কিন্তু তাকে হারাতে পারেন নি। দক্ষিণ ভারতে অভিযানের সময় চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সাথে যুদ্ধ হয়। হর্ষবর্ধন পরাজিত হন। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তির 'আইহোল প্রশস্তি' থেকে এই যুদ্ধের ফলাফল জানা যায়। হর্ষবর্ধন 'শিলাদিত্য' উপাধি নিয়েছিলেন।

শাসন ব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করত মন্ত্রীপরিষদ ও অমাত্যরা। তাঁর সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে (ভুক্তি) এবং প্রদেশগুলি জেলায় (বিষয়) বিভক্ত ছিল। শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম। হর্ষবর্ধন প্রজাদের কাছ থেকে উৎপাদিত ফসলের ১/৬ অংশ কর হিসাবে গ্রহণ করতেন। তিনি বণিকদের থেকেও কর আদায় করতেন।

মনে রাখা জরুরি :

- মগধকে কেন্দ্র করে প্রথম সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়।
- ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যই প্রথম সাম্রাজ্য।
- কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, এরপর তিনি 'ধম্ম' প্রচার শুরু করেন।
- দক্ষিণ ভারতের সাতবাহনরাও গুরুত্বের দাবিদার।
- কুষাণ শাসনেও বেশ কিছু নতুনত্ব দেখা গিয়েছিল।
- সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মতো শাসকেরাও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নজির রেখে গেছেন।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা কে?

(খ) সম্রাট অশোকের পিতার নাম কি?

(গ) কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ঘ) কোন বছর থেকে শকাব্দ গণনা শুরু হয়?

(ঙ) কোন গুপ্ত সম্রাট হুন আক্রমণ প্রতিহত করেন?

(চ) শিলাদিত্য উপাধি কে নিয়েছিলেন?

২. **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) সম্রাট অশোকের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল _____ যুদ্ধ।

(খ) কণিষ্কের রাজধানী ছিল _____।

(গ) সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন _____।

(ঘ) জুনাগড় শিলালেখ থেকে _____ কৃতিত্বের কথা জানা যায়।

(ঙ) রবিকীর্তির _____ থেকে হর্ষবর্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশীর যুদ্ধের কথা জানা যায়।

৩. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক - স্তম্ভ	**খ - স্তম্ভ**
গুপ্তাব্দ	হর্ষবর্ধন
হর্ষাব্দ	কণিষ্ক
শকাব্দ	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

নমুনা প্রশ্নপত্র - ১

১. **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :**

(ক) মুদ্রা কীভাবে ইতিহাস লিখতে সাহায্য করে?

(খ) ইতিহাসের উপাদান হিসেবে লেখ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(গ) পুরাণ কী?

(ঘ) প্রশস্তি কী?

(ঙ) ভারতীয় উপমহাদেশে 'প্রথম নগরায়ণ' কোথায় হয়েছিল?

(চ) সিটাডেল কী?

(ছ) নব্যধর্ম বলতে কী বোঝো?

(জ) চতুর্বর্ণপ্রথা কী?

(ঝ) দুটি গণরাজ্যের নাম লেখো।

(ঞ) সভা ও সমিতি কী?

(ট) তীর্থঙ্কর কাদের বলা হত?

(ঠ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী?

২. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
এলাহাবাদ প্রশস্তি	গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি
নাসিক প্রশস্তি	দ্বিতীয় পুলকেশী
আইহোল প্রশস্তি	সমুদ্রগুপ্ত

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন _____।

(খ) ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব— এই চারটি হল _____।

(গ) বৌদ্ধ ধর্মে প্রধান গ্রন্থ _____।

(ঘ) ধর্ম্মের প্রচার করেন _____।

(ঙ) 'শাকারি' বলা হয় _____।

(চ) 'গুপ্তাব্দ' গোনা শুরু হয় _____।

৪. **সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করো :**

(ক) যুয়ান জাং লেখেন 'ফো-কুয়ো-কি'।

(খ) ফাসিয়ান-এর লেখা বই 'সি-ইউ-কি'।

(গ) পুরাণের সংখ্যা ১৮টি।

(ঘ) মেহেরগড় তামা-পাথরের যুগের সভ্যতা।

(ঙ) হরপ্পা সভ্যতা প্রায়-ইতিহাস যুগের সভ্যতা।

(চ) বৈদিক যুগে সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক।

(ছ) বৈদিক সমাজে সবার উপরে স্থান ছিল ব্রাহ্মণদের।

প্রাচীন ভারতে সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ

৬

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সাহিত্যচর্চার নানা দিকের বর্ণনা দিতে পারবে।
- প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাচীন ভারতের শিল্পচর্চার উন্নতি কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছিল তার বিবরণ দিতে পারবে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। পরবর্তী বৈদিক যুগের পড়াশোনার প্রথা খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদও প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে পড়া হত মুখে মুখে, গুরুর মুখে শোনা কথা ছাত্রদের শুনে মুখস্থ রাখতে হত। বৈদিক শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত, অর্থাৎ গুরু-শিষ্য সম্পর্ক-কেন্দ্রিক। অন্যদিকে বৌদ্ধরা লেখাপড়া শিখত বিহার বা সংঘে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা নীচের ছকে দেখে নেব—

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	যে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান
গুরুকুল ব্যবস্থা	বৈদিক যুগে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে বসবাস করত ও বেদের নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত।
বৌদ্ধ বিহার	রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন জায়গায় বিহার বা সংঘ গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে মহাবিহারও ছিল। এখানে শিক্ষার্থীরা থেকে পড়াশুনা করত। এখানে ধর্মশিক্ষা ছাড়াও কৃষি, চিকিৎসা, রাজ্যশাসন, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত।
বিদ্যালয়	এখানে পাঠ্য বিষয়ে লিপি, ভাষা ও বৈদিক সাহিত্য ছিল প্রধান। পাশাপাশি কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নাটক, আইন, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যাও পড়ানো হত।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক নাগাদ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার কথা জানা যায়। এই সময় বেদের পাশাপাশি ছন্দ, কাব্য, ব্যাকরণও পড়ানো হত। তার সংগে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ণ প্রভৃতি বিষয়ও পড়তে হত। গুপ্তযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় দুটি বৌদ্ধবিহারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, — তক্ষশিলা ও নালন্দা মহাবিহার।

- **তক্ষশিলা মহাবিহার :** গান্ধার মহাজনপদের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। গ্রিক, পারসিক, কুষাণ, শক নানা বিদেশি শক্তি নানা সময়ে তক্ষশিলা দখল করে। ফলে সেখানে নানা দেশের মানুষ ও পণ্ডিত লোকের আনাগোনা ছিল। বৌদ্ধধর্ম তক্ষশিলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এখানে যোগ্যতা যাচাই করে ছাত্রদের ভরতি করা হত। রাজা ও ব্যবসায়ীরা এই মহাবিহার চালানোর অর্থ দিতেন। এই মহাবিহারের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র— জীবক, পাণিনি ও চাণক্য।

- **নালন্দা বৌদ্ধবিহার :** সম্ভবত গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে এই বৌদ্ধবিহার তৈরি হয়। এর শিক্ষাপ্রদানের খ্যাতি সমগ্র এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের বাইরে থেকে এখানে ছাত্ররা পড়তে আসত। ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার পয়সা লাগত না। বিভিন্ন রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা অর্থ সাহায্য করত। চীনা পরিব্রাজক ইউয়েন সাঙ এখানে শিক্ষালাভ করেন। এখানে ৮৫০০ জন ছাত্র ও ১৫০০ জন শিক্ষক ছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যচর্চায় পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার লিখিত অনেক কাব্যগ্রন্থ দেখা যায় :—

গ্রন্থের নাম	কী ধরনের গ্রন্থ	লেখকের নাম
অর্থশাস্ত্র	রাজনৈতিক	কৌটিল্য
মৃচ্ছকটিকম	নাটক	শুদ্রক
বুদ্ধচরিত	কাব্য	অশ্বঘোষ
মেঘদূতম, কুমারসম্ভবম, অভিজ্ঞান শকুন্তলম	কাব্য	কালিদাস
নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা	নাটক	হর্ষবর্ধন
পঞ্চতন্ত্র	নীতিগল্প	বিষ্ণুশর্মা
মুদ্রারাক্ষস	নাটক	বিশাখ দত্ত
মহাভাষ্য	ব্যাকরণ	পতঞ্জলি

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান

(২) ধাতুবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান

(৩) স্থাপত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান

(৪) গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ

(৫) কৃষিবিজ্ঞান

বিজ্ঞানীর নাম	বিজ্ঞানের কোন শাখা	আবিষ্কার	লিখিত বই
আর্যভট্ট	জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত	শূন্যের ব্যবহার শুরু করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী গোলাকার।	আর্যভটীয়
বরাহমিহির	জ্যোতির্বিজ্ঞান	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও তার। আগাম লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেন। ভূমিকম্পের বিষয়েও আলোচনা করেন।	সূর্যসিদ্ধান্ত, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা
ব্রহ্মগুপ্ত	জ্যোতির্বিজ্ঞান	গণিত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন।	ব্রহ্মসিদ্ধান্ত
শুশ্রুত	চিকিৎসাবিজ্ঞান	শল্যচিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।	শুশ্রুত সংহিতা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পচর্চা :

এইসময় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। সম্রাট অশোক অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপ বানিয়েছিলেন। যেমন— সারানাথ, সাঁচী প্রভৃতি। সারানাথে অশোকস্তম্ভ দেখা যায়। ভাস্কর্য শিল্পও ছিল উন্নতমানের। শক-কুষাণ যুগে গান্ধার ও মথুরার শিল্পরীতি ছিল খুব বিখ্যাত। গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পের সবচাইতে বড়ো উদাহরণ—অজন্তা গুহার ছবিগুলি। অজন্তা ছাড়া ইলোরাতেও বেশ কিছু ছবি পাওয়া গিয়েছে। গুপ্তযুগ ও পল্লবযুগের মন্দিরগুলিতে নানা দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল। যেমন— কৈলাস মন্দিরে রামায়ণের প্যানেল, দশাবতার মন্দিরে ভাস্কর্য।

মনে রাখা জরুরি :

- প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল।
- প্রাচীন ভারতে কৌটিল্য, শূদ্রক, কালিদাস, পতঞ্জলির মত বিখ্যাত সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা তাঁদের লেখার মাধ্যমে সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটান।
- প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন।

নমুনা প্রশ্ন

১. নীচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করো :

(ক) বৈদিক শিক্ষা ছিল _____।

(খ) মেঘদূতম কাব্যটি লিখেছেন _____ ।

(গ) চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ হল _____ ।

(ঘ) গুহাচিত্রের জন্য বিখ্যাত হল _____।

২. অতি সংক্ষেপে লেখো (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) কাদের শাসনকালে নালন্দা বৌদ্ধবিহার তৈরি হয়?

(খ) কোন চীনা পরিব্রাজক নালন্দাতে পড়াশোনা করেছিলেন?

(গ) তক্ষশিলা কোথাকার রাজধানী ছিল?

(ঘ) 'পঞ্চতন্ত্রের' লেখক কে?

(ঙ) 'বুদ্ধচরিত' কে লিখেছেন?

(চ) কৌটিল্যের লেখা বইটির নাম কী?

(ছ) 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটির লেখক কে?

(জ) 'সূর্যসিদ্ধান্ত' বইটির লেখক কে?

এক নজরে প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা

৭

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক সভ্যতাগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- ভারত ও বর্হিবিশ্বের মধ্যে যোগাযোগ কিভাবে ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিল জনপদ। এই জনপদগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠলো সভ্যতা। প্রাচীনকালে ভারত উপমহাদেশে আমরা দুটি সভ্যতার উল্লেখ পাই — মেহেরগড় সভ্যতা ও হরপ্পা সভ্যতা। হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি সভ্যতার উল্লেখ আমরা পাই। নীচে বিভিন্ন সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো —

(১) মেসোপটেমিয়া সভ্যতা :

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস এই দুটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। এই মেসোপটেমিয়ার একটি অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় সভ্যতা এবং সুমের ছাড়াও মেসোপটেমিয়ার আরেকটি বিখ্যাত সভ্যতা ছিল ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। সুমেরীয় লিপিকে 'কিউনিফর্ম' বলা হয়। সুমেরের লোকেরা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করত। ব্যাবিলনের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন হামুরাবী, যিনি প্রথম লিখিত আইন চালু করেছিলেন।

(২) মিশরীয় সভ্যতা :

নীলনদকে কেন্দ্র করেই মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। নীলনদের জল সেচন করেই এখানে চাষ-আবাদ হত। নীলনদ না থাকলে এই সভ্যতা শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হতো। সেইজন্য মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়। মিশরের শাসকদের ফ্যারাও বলা হতো। মিশরে প্যাপিরাস গাছের ছালে লেখা শুরু হয়। এই প্যাপিরাস থেকে ইংরাজিতে পেপার শব্দ এসেছে। মিশরের লিপিগুলি ছিল ছবির মতো। এই লিপিকে হায়রোগ্লিফ লিপি বলা হয়। এই সময়ে ফ্যারাও ও ধনী লোকেদের মৃতদেহ 'মমি' করে রাখা হতো ও বিভিন্ন পিরামিডে সমাহিত করা হতো।

(৩) চৈনিক সভ্যতা : পূর্ব এশিয়ার ইয়াংসি-কিয়াং ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন চিন সভ্যতা। চিনারাই প্রথম কাগজ তৈরি ও কাঠের ফলকে ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। চিন সম্রাটরা বাইরের শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে প্রাচীর দিয়ে সাম্রাজ্য ঘিরে রেখেছিলেন। চিনে বারুদের ব্যবহার হতো।

(৪) গ্রিক সভ্যতা :

প্রাচীন গ্রিসে পাহাড় ঘেরা অনেক ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এগুলিকে বলা হতো নগররাষ্ট্র বা পলিস। এথেন্স ও স্পার্টা ছিল সে যুগের বিখ্যাত পলিস। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় হেরোডোটাস ও থুকিডিডিসের লেখায়।

(৫) রোমান সভ্যতা :

ভূমধ্যসাগরের ইটালির উপকূলে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এক সময় রোমান সভ্যতা বিরাট আকার ধারণ করেছিল। রোমে আইন, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল। রোমের রাজকর্মচারীর আদেশেই যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়।

(৬) পারসিক সাম্রাজ্য :

পারস্য উপসাগরের উত্তরে গড়ে উঠেছিল বিরাট পারসিক সাম্রাজ্য। পারস্য সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। পারসিক সাম্রাজ্যের দু-জন বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন — কুরুষ ও প্রথম দরায়বৌষ।

ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতাগুলির সাথে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগের নানারকম দিক ছিল। সেগুলি হল:—

	যোগাযোগের কারণ
ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলির সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার যোগাযোগ	→ বিদেশী জাতির আগমন
	→ রাজ্যজয় ও দূত বিনিময়
	→ ব্যবসা-বাণিজ্য
	→ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
	→ ধর্মপ্রচার ও তীর্থযাত্রা
	→ পড়াশোনা

ভারত ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম :

রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম :

ভারতীয় উপমহাদেশ ও পারস্যের সঙ্গে যোগাযোগ— উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল গান্ধার রাজ্য। গান্ধারের মধ্য দিয়ে পারসিক সাম্রাজ্যের সাথে যোগযোগ তৈরি হয়েছিল। পারসিক সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট দরায়বৌষ এর শাসনকালে এই ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু অংশ তার শাসনাধীনে ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় ইন্দুস বা ইন্ডিয়া ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বা স্যাট্রাপি।

ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগ :

গ্রীক বীর আলেকজান্ডার পাসকিদের হারিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছান। কিন্তু তিনি বেশিদিন ভারতীয় উপমহাদেশে ছিলেন না। ফলে এই অভিযানের প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশে গভীরভাবে পড়েনি। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি এই অভিযানে আলেকজান্ডারকে সহযোগিতা করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ :

ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিক দেশ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ দিকে ব্যাকট্রিয়া গ্রীকশাসক সেলুকাসের অধীনে ছিল। মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠীর আক্রমণে ব্যাকট্রিয়া গ্রিকশাসন শেষ হয়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিল স্কাইথীয়রা। উপমহাদেশে তারা শক নামে পরিচিত। আর ছিল ইউয়ে-ঝি বা কুষাণ। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে তারা ব্যাকট্রিয়ায় পৌঁছেছিল। ইন্দো-গ্রীক রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন মিনান্দার।

দূত বিনিময় :

ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরের যোগাযোগের জন্য মৌর্য সম্রাটরা বিভিন্ন দেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ে তাদের দরবারেও বিদেশী দূতরা আসতেন। গ্রীক শাসক সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে এসেছিলেন। মৌর্য সম্রাট বিন্দুসারের সঙ্গে সিরিয়ার শাসক অ্যান্টিওকাস-এর যোগাযোগ ছিল। সম্রাট অশোক সিরিয়া, মিশর, সিংহল প্রভৃতি দেশে ধর্মদূত পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন চিনের সঙ্গে দূত বিনিময় করেছিলেন বলে জানা যায়।

অর্থনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম :

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকে উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। জলপথ ও স্থলপথ-এই দুইভাবেই যোগাযোগ হতো। রোম সাম্রাজ্যে ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে চিন ও ভারতের নানা জিনিসের চাহিদা ছিল। এর মধ্যে সবথেকে বেশি কদর ছিল চিনা রেশমের। রেশম ছিল স্থলপথগুলির প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। জলপথেও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সঙ্গে রোমের বাণিজ্য চলত। পশ্চিম উপকূলের সেরা বন্দর ছিল নর্মদা নদীর মোহনায় ভৃগুকচ্ছ। মালাবার উপকূলের বন্দরগুলি দিয়ে গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলার বাণিজ্য চলত।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম :

ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের অঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মেলামেশার মাধ্যমে।

- পারসিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। পারসিক সাম্রাজ্যে আরামীয় ভাষা ও লিপি চালু ছিল। পরবর্তীকালে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে সম্রাট অশোক আরামীয় ভাষা ও লিপি ব্যবহার করেছিলেন। সম্ভবত এই আরামীয় লিপি থেকে খরোষ্ঠী লিপি তৈরি হয়েছে।
- পারসিক শাসকরা উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানাতেন। সম্ভবত এর প্রভাবেই মৌর্য শাসকরা উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানান।
- আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর গ্রীকরা এখানে থাকতে শুরু করে। গ্রীকরা এই উপমহাদেশের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়। ইন্দো-গ্রীকরা সোনার মুদ্রা চালু করে। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় গ্রীক ও ভারতীয় ভাবনা-চিন্তার বিনিময় দেখা যায়। ওই সময়ে গ্রীক প্রভাবিত শিল্পের চর্চাও শুরু হয়েছিল। যার অন্যতম উদাহরণ হলো— গান্ধার শিল্প।
- শক শাসকরা নানারকম রুপোর মুদ্রা চালু করেন। শক শাসক মোগ 'রাজাতিরাজ' উপাধি নেন। তাঁর এই উপাধিটা রাজাধিরাজ উপাধি থেকে এসেছে।
- শক, পহ্লব, কুষাণদের যুদ্ধনীতি, পোষাক, ঘরবাড়ি অনেককিছুতেই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ছাপ রয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষা :

ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগের আর একটি মাধ্যম ছিল বৌদ্ধধর্ম। অনেক বৌদ্ধশিক্ষক বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিতে যেতেন। যেমন— বুদ্ধযশ, কুমারজীব প্রমুখ। আবার বিদেশ থেকে অনেকে এদেশে বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য আসতেন। যেমন— ফাসিয়ান, সুয়ানজাং প্রমুখ।

মনে রাখা জরুরি :

- টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বলা হয়।
- ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা ছিলেন হামুরাবি।
- মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।
- মিশরের শাসক ফ্যারাওদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্য পিরামিড বানানো হতো।
- হোয়াংহো ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল প্রাচীন চিন সভ্যতা।
- চিনেই প্রথম কাগজ ও কাঠের হরফ বসানোর কৌশল তৈরি হয়।
- প্রাচীন গ্রিসে পাহাড় ঘেরা ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রকে পলিস বলা হত।
- প্রখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক ছিলেন হেরোডোটাস এবং থুকিডিডিস।
- গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে ভারতে আসেন।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে লেখো (একটি - দুটি বাক্যে) :

(ক) মেসোপটেমিয়া সভ্যতা কোন কোন নদীর মাঝে গড়ে উঠেছে?

(খ) মিশরীয় লিপিকে কী বলা হয়?

(গ) পাহাড়ে ঘেরা গ্রীসের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে কী বলা হতো?

(ঘ) মিশরের শাসকদের কী বলা হতো?

(ঙ) ইন্দো-গ্রীক রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কে?

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) সুমেরীয় লিপিকে _____ বলে।

(খ) বারুদের ব্যবহার হতো _____।

(গ) অম্ভি ছিলেন _____ রাজা।

(ঘ) চিনের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য ছিল _____।

(ঙ) আরামীয় লিপি থেকে _____ লিপি তৈরি হয়েছে।

নগরায়ণ

৮

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভারতে বিভিন্ন পর্বে নগরায়ণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবে।
- ভারতে বিভিন্ন পর্বে গড়ে ওঠার নগরের তালিকা বানাতে পারবে।
- নগরায়ণের বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারবে।

ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম নগর গড়ে উঠেছিল। তাই একে *প্রথম নগরায়ণ* বলা হয়। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পা ছিল সবচেয়ে বড়ো দুটো নগর। সে তুলনায় লোথাল ও কালিবঙ্গান ছিল ছোটো। হয়তো হরপ্পা সভ্যতায় নগরগুলোর ক্ষেত্রে ছোটো-বড়ো তফাত ছিল। গুরুত্বের দিক থেকে সমস্ত নগর সমান ছিল না।

হরপ্পার নগরগুলিতে বসতি অঞ্চল দুটি স্পষ্ট ও আলাদা এলাকায় ভাগ করা ছিল। শহরে একটি উঁচু এলাকা থাকত। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাকে বলেন *সিটাডেল*। এই এলাকাটি একটা বানানো ঢিবির ওপর অবস্থিত ছিল। সাধারণত ঢিবিটি আয়তাকার হতো। উঁচু এলাকায় বানানো হতো জরুরি ইমারত। সেগুলি সচরাচর সাধারণ মানুষের থাকার বাড়ি হতো না। নগরের প্রধান বসতি এলাকাটা নীচু অঞ্চলে থাকত। ঐ অঞ্চলে ইমারতগুলির মধ্যে বেশিরভাগই বসত বাড়ি। উঁচু এলাকাটি প্রায়শই নগরের উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকত। নীচু বসতি এলাকাটা থাকত পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। একমাত্র চানহুদাড়োতে কোনো সিটাডেল ছিল না।

সিটাডেল এলাকাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। হরপ্পায় নগরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে দুটি ঢোকা ও বেরোনোর ফটক ছিল। মহেনজোদাড়োতে উঁচু এলাকায় একটি বড়ো জলাধার ছিল। সেটি পাকা পোড়ানো ইটের তৈরি। বোধহয় স্নান করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। আয়তাকার জলাধারটিতে ওঠানামার জন্য সিঁড়ির ধাপও ছিল। জলাধারটির কাছাকাছি কয়েকটি ছোটো ঘরও দেখা যায়। জলাধারটি সম্ভবত নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যবহার করতেন।

হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনে খাদ্যশস্য মজুত রাখার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পায় খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য দুটি বড়ো জায়গা ছিল। সেগুলি অনেকটা পাকা ইটের তৈরি বাড়ির মতো।

মহেনজোদাড়োর উঁচু এলাকায় আরেকটি বিশাল ইমারত পাওয়া গেছে। মনে করা হয় সেটি সাধারণ থাকার বাড়ি নয়। এই ইমারতটি সম্ভবত বড়ো কোনো উৎসবে জমায়েত হওয়ার জন্য ব্যবহার হতো। ঢোলাবিরা নগরের সিটাডেল এলাকায় একটি জলাধারও দেখা যায়।

নগরের নীচু এলাকায় থাকত মূল বসতি। বাড়িগুলির নানারকম আকার দেখা যায়। মহেনজোদাড়োতে প্রায় ৩০০ বর্গ মিটার আয়তনের একটি বাড়ি পাওয়া গেছে। তাতে সাতাশটা ঘর ও একটি আঙিনা ছিল। আরেকটা বড়ো বাড়িতে উপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঐ বাড়িটির হয়তো অনেকগুলি তলা ছিল। ঐ ধরনের বড়ো বাড়িতে ধনী মানুষেরাই থাকতেন বলে মনে করা হয়।

বসত বাড়িগুলিতে বেশ কিছু ঘর থাকলেও রান্নাঘর থাকত একটি। মনে করা হয় ঐ বাড়ির বাসিন্দাদের একটিই হেঁসেল ছিল। হয়তো হরপ্পা সভ্যতায় যৌথ পরিবার ছিল। ছোটো বাড়িগুলি দেখে মনে হয় সেগুলিতে গরিব মানুষেরা থাকতেন। এর থেকে হরপ্পার নগর জীবনে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শৌচাগার ও স্নানাগার। এর থেকে মনে হয় নগরগুলি সাধারণভাবে পরিষ্কার ছিল। মহেনজোদাড়োর নীচু এলাকায় প্রায় দু-হাজার বাড়ির জন্য অন্তত সাতাশটা কুয়ো ছিল। হরপ্পায় অত কুয়ো না থাকলেও, প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার ছিল। পাকা নর্দমা দিয়ে জল নিকাশি ব্যবস্থাও ছিল। বড়ো নর্দমাগুলি ঢাকা থাকত। প্রতিটি বাড়ি থেকে ছোটো নালা গিয়ে মিশত বড়ো নর্দমাগুলোয়। উন্নত নগর শাসনের নমুনা ছিল এই জল নিকাশি ব্যবস্থা।

ছবি: মহেনজোদাড়োর স্নানাগার

শহরের নীচু এলাকায় যাতায়াতের উপযোগী সড়ক ছিল। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পায় বেশ কয়েকটি চওড়া, পাকা রাস্তা দেখা গেছে। ওই রাস্তাগুলি সাধারণত উত্তর-দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। তুলনায় কম চওড়া রাস্তা ও সরু গলিগুলো ছিল পূর্ব-পশ্চিমে। পথঘাটের এরকম পরিকল্পনার জন্য নগরের নকশাগুলো হতো চৌকো আকারের। মনে হয় হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনের মান ছিল খুব উঁচু। সেই মান ধরে রাখার জন্য নিশ্চয়ই দক্ষ ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার দরকার হতো। নগরের উঁচু অংশে সম্ভবত প্রশাসকরা থাকতেন ।

ছবি : হরপ্পা সভ্যতার একটি কূপ

বাণিজ্যের উন্নতির কারণে হরপ্পার নগরগুলিতে হয়তো বণিকদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তারপরে ছিল বিভিন্ন কারিগর ও পেশার মানুষ। মনে হয় এই সমাজে মজুর ও শ্রমিকদের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। তবে এরা সবাই নগরেই বাস করত। নগরের বাইরে গ্রামীণ এলাকায় থাকত কৃষিজীবী মানুষ।

প্রাচীন ভারতে গ্রামের থেকে বড়ো অঞ্চলকে *জন* বলা হতো। সেই *জন*-কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল ছোটো ছোটো রাজ্য। এইভাবে *জন* শব্দ থেকেই *জনপদ* শব্দটি এসেছিল। আরেক দিক থেকে সাধারণ মানুষ বা জনগণ যেখানে বাস করত তাকে বলা হতো *জনপদ*। অর্থাৎ জনগণ যেখানে পা বা *পদ* রাখেন, সেটাই *জনপদ*। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণ পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকলে তা *জনপদ* হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে এইরকম অনেকগুলি জনপদের কথা জানা যায়। সেসব জনপদগুলি অনেক সময়েই পরিচিত হতো সেখানকার শাসক বংশের নামে। ঐ জনপদগুলিকে ভিত্তি করেই পরের দিকে বড়ো বড়ো রাজ্য তৈরি হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে এরকম জনপদের খোঁজ পেয়েছেন। মগধের মতো কয়েকটি জনপদ আস্তে আস্তে মহাজনপদে পরিণত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ একেকটা জনপদের ক্ষমতা ক্রমে বাড়তে থাকে। সেখানকার শাসকরা যুদ্ধ করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে থাকেন। ছোটো ছোটো জনপদগুলির কয়েকটি পরিণত হয় বড়ো রাজ্যে। এই বড়ো রাজ্যগুলিই *মহাজনপদ* বলে পরিচিত হয়। জনপদের থেকে যা আয়তন ও ক্ষমতায় বড়ো তাই *মহাজনপদ*। মহাজনপদগুলির শাসকরা ছিলেন বৈদিক যুগের রাজাদের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁদের হাতে অনেক সম্পদ জমা হলো। সেই সম্পদ ব্যবহার করে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা আরো বাড়াতে চাইলেন। ফলে প্রায়শই লেগে থাকত যুদ্ধ।

জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও জনপদ-মহাজনপদের আলোচনা পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে ষোলোটি মহাজনপদের কথা জানা যায়। সেইসময়ে এদেরকে একসঙ্গে *ষোড়শ মহাজনপদ* বলা হতো। মহাজনপদগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। একে অন্যের রাজ্য জয় করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে চাইত। এইভাবে ক্রমে ষোলোটা মহাজনপদ কমতে কমতে চারটে মহাজনপদে এসে দাঁড়াল। এগুলি হলো অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। এই চারটে মহাজনপদ আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করত। তাদের মধ্যে শেষপর্যন্ত মগধ হয়ে ওঠে সবথেকে বেশি শক্তিশালী।

ষোলোটি মহাজনপদের বেশিরভাগই ছিল আজকের মধ্য ও উত্তর ভারত অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহাজনপদ ছিল অস্মক। গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাকে ভিত্তি করেই বেশিরভাগ মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল। গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চল ছিল সেই সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনীতির মূল কেন্দ্র।

Ÿ£î- ˜†î Ÿ · †öœy ¢îyî£ ‹y˜yÐ ò˜†îó Ÿ · Ýþy ¢,ßþ“þ öíö„þ ~ö¢öŠÐ xyîyî òŸ£îó „þíyÝþy šþyî!¢Ð ¢œ“þy!˜ ç ›‡œ xy›öœ ¦þyîö“þ @ìy› !Šœ- xyîyî !Šœ xö˜„þ Ÿ£î îy ˜†îÐ “þyî ö„þyö˜yÝþy !Šœ xy!í„þ öœ˜ö”˜- îÄî¢yôîy!’ö‹Äî ²ìy’ö„þwÐ îy‹÷˜!“þ„þ ~î, ²ìŸy¢!˜„þ „þyîö’ç Ÿ£î †övþ vþàþ“þÐ xyîyî •›#ë þíy˜ îy ›!¨îô›¢!‹”ö„þ !‡öî †övþ vþöàþ!Šœ ö„þyö˜y ö„þyö˜y Ÿ£îÐ

শহরের নাম	প্রতিষ্ঠাতা	রাজবংশ	সময়
১. কিলা রাই পিথোরা	পৃথ্বীরাজ	চৌহান (রাজপুত)	আনুমানিক ১১৮০ খ্রিস্টাব্দ
২. সিরি	আলাউদ্দিন খলজি	খলজি (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ
৩. তুঘলকাবাদ	গিয়াস উদ্দিন তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩২১ খ্রিস্টাব্দ
৪. জাহানপনাহ	মহম্মদ বিন তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ
৫. ফিরোজাবাদ (ফিরোজ শাহ কোটলা)	ফিরোজ শাহ তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৬. দীন পনাহ, শেরগাহ (পুরোনো কেল্লা)	হুমায়ুন শেরশাহ	মুঘল সুর (আফগান)	আনুমানিক ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ
৭. শাহজাহানাবাদ	শাহজাহান	মুঘল	আনুমানিক ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ

মনে রাখা জরুরি :

- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নগরায়ণের প্রমাণ মেলে হরপ্পা সভ্যতাতে।
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল।
- সুলতানি ও মুঘল আমলে প্রশাসনিক কেন্দ্র, বাণিজ্য কেন্দ্র, ধর্মীয় স্থান প্রভৃতি জায়গাকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠেছিল।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) নগরায়ণ কী?

(খ) সিটাডেল বলতে কী বোঝো?

(গ) জনপদ কাকে বলে?

(ঘ) মহাজনপদ কী?

২. **সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করো :**

(ক) সিটাডেল ছিল না একমাত্র চানহুদাড়োতে।

(খ) দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহাজনপদ অস্মক।

(গ) দীন পনাহ, শহর নির্মাণ করেন আলাউদ্দিন খলজি

(ঘ) ফিরোজাবাদ শহর গড়ে তোলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) হরপ্পা সভ্যতায় প্রশাসকেরা থাকতেন _____।

(খ) ষোড়শ মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল _____ কেন্দ্র করে।

(গ) জাহানপনাহ শহর প্রতিষ্ঠা করেন _____।

(ঘ) তুঘলকাবাদ নগরটি গড়ে তোলেন _____।

নমুনা প্রশ্নপত্র - ২

১. **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :**

(ক) কোন দুটি নদীকে কেন্দ্র করে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

(খ) কোন কোন নদীর ওপর নির্ভর করে চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

(গ) মিশরকে কেন 'নীলনদের দান' বলা হয়?

(ঘ) বৈদিক যুগে কেমন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল?

(ঙ) গান্ধার শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

(চ) পলিস কী?

(ছ) মহাজনপদ কী?

(জ) সিরি নগরটি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

(ঝ) হরপ্পার নগরগুলির রাস্তা কেমন ছিল?

(ঞ) কিলা রাই পিথোরা শহরটি কে গড়ে তুলেছিলেন?

২. **ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :**

(ক) গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা।

(খ) সুমেরীয় লিপিকে 'হায়রোগ্লিফ' বলা হয়।

(গ) মিশরীয় লিপিকে 'কিউনিফর্ম' বলা হয়।

(ঘ) গান্ধার মহাজনপদের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা।

(ঙ) স্পার্টা ও এথেন্স বিখ্যাত নগরারাষ্ট্র।

(চ) গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে নালন্দা তৈরি হয়।

(ছ) রোম-ভারত বাণিজ্যে মূল্যবান পণ্য ছিল রেশম।

(জ) 'মহাভাষ্য' লেখেন পতঞ্জলি।

(ঝ) চানহুদাড়োতে কোনো সিটাডেল ছিল না।

(ঞ) হরপ্পাতে একটি বড় জলাধারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) 'বুদ্ধচরিত' রচনা করেন _____।

(খ) 'প্রিয়দর্শিকা' নাটকটি লেখেন _____।

(গ) মিনান্দার ছিলেন বিখ্যাত _____।

(ঘ) কাগজ ও ছাপার পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করে _____।

(ঙ) মিশরের শাসককে _____ বলা হত।

৪. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক - স্তম্ভ	**খ - স্তম্ভ**
অর্থশাস্ত্র	বিষ্ণুশর্মা
মুদ্রারাক্ষস	শুদ্রক
অভিজ্ঞান শকুন্তলম	বিশাখ দত্ত
মৃচ্ছকটিকম	কালিদাস
পঞ্চতন্ত্র	কৌটিল্য

পশ্চিমবঙ্গের রূপরেখা

৯

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
- পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক সীমানা, ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দিতে পারবে।
- পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সদর শহর এবং নদনদীর তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

আমরা যে রাজ্যে বাস করি তার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এটি ভারতবর্ষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজ্য। ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন ইংরেজদের দখলে ছিল। এই সময় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ও প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা। প্রথম থেকেই ইংরেজরা চেয়েছিল নানা অজুহাতে বাংলাকে দুটি ভাগ করতে। এই কার্যসিদ্ধির জন্য ঘোষিত হয়েছিল 'বঙ্গভঙ্গ' আইন। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কাছে ইংরেজরা নতিস্বীকার করে। বঙ্গভঙ্গ বা বাংলাকে ভাগ করার চেষ্টা বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য মনীষীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন হয় ভারতবর্ষ। কিন্তু বাংলা দুটি ভাগে বিভক্ত হয় — একটি পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) ও অপরটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ (বাংলাদেশের পশ্চিমভাগ)।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ

যেকোনো দেশের কোনো একটি রাজ্য সম্পর্কে জানতে হলে তার ভৌগোলিক সীমানা, অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল, নদ-নদী ও মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গের গঠনগত বিভাগ ও তার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল

	ভূপ্রাকৃতিক গঠনগত বিভাগ	অন্তর্ভুক্ত যেকোনো দুটি অঞ্চল
১.	উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল	● দার্জিলিং, কালিম্পং
২.	তরাই অঞ্চল	● জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার
৩.	উত্তরবঙ্গের সমভূমি	● কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর
৪.	রাঢ় অঞ্চল	● বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর
৫.	পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি	● পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান
৬.	গাঙ্গেয় সমভূমি	● পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া

নদীমাতৃক জনজীবন

পশ্চিমবঙ্গে বহু নদ-নদী প্রবহমান। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে অগণিত নদ-নদী বয়ে চলেছে। তবে তাদের প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গা, যার উৎসস্থল গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা থেকে। গঙ্গা উত্তর প্রদেশ, বিহারের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে দুটি ভাগে ভাগ হয়। একটি ভাগ 'পদ্মা' নামে বাংলাদেশে ও আর একটি ভাগ 'ভাগীরথী' নামে পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে ডায়মন্ড হারবার, হলদিয়া পেরিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই নদী হুগলী নদী নামেও পরিচিত। নীচে পশ্চিমবঙ্গের একটি নদী মানচিত্র দেওয়া হল যা থেকে এসম্পর্কে আরও বিশদ ধারণা পাওয়া যাবে।

নদ-নদী জনজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এই নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বহু শহর, নগর, কলকারখানা।

একনজরে পশ্চিমবঙ্গের নদী তীরে গড়ে ওঠা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শহর ও নদীর নাম

	উল্লেখযোগ্য সদর শহর	উল্লেখযোগ্য নদীর নাম
১.	জলপাইগুড়ি জেলা- জলপাইগুড়ি	● তিস্তা ও করলা নদীর তীরবর্তী শহর।
২.	কোচবিহার জেলা- কোচবিহার	● তোর্সা নদীর তীরে অবস্থিত।
৩.	রায়গঞ্জ জেলা- উত্তর দিনাজপুর	● পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কুলিক নদী।
৪.	বালুরঘাট জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর	● আত্রেয়ী নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত।
৫.	ইংলিশ বাজার জেলা- মালদা	● মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত।
৬.	বহরমপুর জেলা— মুর্শিদাবাদ	● ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত।
৭.	আসানসোল জেলা— পশ্চিম বর্ধমান	● পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বরাকর নদী।
৮.	তমলুক জেলা— পশ্চিম মেদিনীপুর	● রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত।
৯.	মেদিনীপুর জেলা— পশ্চিম মেদিনীপুর	● কংসাবতীর তীরে অবস্থিত।
১০.	হাওড়া জেলা— হাওড়া	● হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত।
১১.	কলকাতা জেলা— কলকাতা	● হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহর।

মনে রাখা জরুরি :

- পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা।
- ভূপ্রকৃতির ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের বেশ কটি উল্লেখযোগ্য সদর শহর পশ্চিমবঙ্গে বহমান নদী তীরে গড়ে উঠেছে।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) আমরা যে রাজ্যে বাস করি তার নাম _____।

(খ) ইংরেজরা বাংলাকে দুটি ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেছিলেন _____ আইন জারি করে।

(গ) গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হলো _____।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী _____।

(ঙ) তোর্সা নদীর তীরে অবস্থিত _____ শহর।

২. স্তম্ভ মেলাও :

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
দার্জিলিং	রাঢ় অঞ্চল
কোচবিহার	বাংলাদেশ
বাঁকুড়া	উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল
পদ্মা	উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল

৩. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি লেখ :

(ক) পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রাকৃতিক গঠনগত বিভাগগুলি কি কি?

(খ) জলপাইগুড়ি ও ইংলিশবাজার শহর দুটি কোন কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

(গ) প্রাচীন বাংলাকে ইংরেজরা কেন ভাগ করতে চেয়েছিল?

(ঘ) স্বাধীনতার পরে বাংলাকে কটি ভাগে ভাগ করা হয়? কি কি?

৪. বিশদভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহরের নাম কী? এটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

(খ) ইংরেজরা কেন বঙ্গভঙ্গ আইন জারি করেছিল?

দিবস পালন

১০

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- বৈচিত্র্যময় দেশ ভারতবর্ষে নানান বৈচিত্র্যের মধ্যেও এখানকার মানুষের মধ্যে যে ঐক্য বিদ্যমান — তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৈচিত্র্যময় ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালনের দিনগুলির বর্ণনা দিতে পারবে।
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

ভারত একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী মানুষের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা, খাবার ও সংস্কৃতি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এত পার্থক্য সত্ত্বেও সকলে একই ভূখণ্ডে মিলেমিশে বসবাস করে। এই ঐতিহ্যের জন্যই ভারতে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' বিরাজমন। ভারতে নানা সময় নানা রকম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালন করা হয়। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিন আমরা পালন করে থাকি। এর মাধ্যমে—

- বৈচিত্র্যময় দেশে সকলকে একই সূত্রে বেঁধে রাখা সম্ভব
- জাতীয়তাবোধের ভাব তৈরি হয়
- জাতীয় দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়
- দিবসগুলির সঙ্গে যুক্ত ঘটনা, মনীষীদের সম্পর্কে জানা যায়

নীচের ছক দেখে নেবো কোন কোন দিবস কবে, কেন ভারতের সর্বত্র পালিত হয়।

	তারিখ	দিবসের নাম	কেন পালন করা হয়
১.	১৫ই আগস্ট	স্বাধীনতা দিবস	● ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।
২.	২৬শে জানুয়ারি	সাধারণতন্ত্র দিবস	● স্বাধীন ভারতবর্ষে ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি কার্যকরী হয়। এই দিনটি সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়।
৩.	৫ই সেপ্টেম্বর	শিক্ষক দিবস	● ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ছিলেন একজন শিক্ষক ও ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিক্ষক দিবস উৎযাপিত হয়।
৪.	১৪ই নভেম্বর	শিশু দিবস	● পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিশু দিবস পালিত হয়।
৫.	১৪ই জুলাই থেকে ২১শে জুলাই	অরণ্য সপ্তাহ	● প্রাণী জগতের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই সময় বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

মনে রাখা জরুরি :

- আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সব অর্থেই একটি বৈচিত্র্যময় দেশ।
- ভারতীয়দের ভাষা, পোষাক, সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও অন্তর্নিহিত এক ঐক্য এখানে বিদ্যমান।
- ভারতবর্ষের কিছু নিজস্ব উৎসব পালনের দিন রয়েছে; যেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয় _____ দিনটি।

(খ) ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে _____ বিরাজমান।

(গ) স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন _____।

(ঘ) ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী _____ দিবস পালিত হয়।

(ঙ) ভারতীয় সংবিধান রচিত হয় _____ এর নেতৃত্বে।

২. ঠিক না ভুল নির্ণয় করো :

(ক) ৫ই সেপ্টেম্বর শিশু দিবস পালিত হয়।

(খ) ভারত ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন করে।

(গ) ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

(ঘ) স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন ছিল।

(ঙ) সাধারণতন্ত্রে রাজাই সব।

৩. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) কোন সময়ে অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয়?

(খ) দিবস পালনের গুরুত্ব কী?

(গ) আমরা শিক্ষক দিবস কবে, কেন পালন করি?

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

১১

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বা ধারার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুত্বও বর্ণনা করতে পারবে।
- পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অবদান ব্যাখা করতে পারবে।

ভারতের স্বাধীনতা একটি সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্বের কথা আমরা নীচে আলোচনা করবো।

নাম	পরিচয় ও অবদান	ছবি
(১) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (১৮৬৯ – ১৯৪৮)	● বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ● সাধারণ মানুষকে একজোট করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন	
(২) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭ –)	● বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ● ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিলেন	
(৩) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) (১৮৭৯ – ১৯১৫)	● বিশিষ্ট ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী নেতা ● ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন	
(৪) ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯ – ১৯০৮)	● বিশিষ্ট বাঙালি বিপ্লবী ● দেশের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন	
(৫) সূর্য সেন (মাস্টারদা) (১৮৯৪ – ১৯৩৪)	● ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ● চট্টোগ্রামে সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন	

নাম	পরিচয় ও অবদান	ছবি
(৬) ভগৎ সিং (১৯০৭ – ১৯৩১)	● বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ● ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন	
(৭) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১ – ১৯৩২)	● বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ● ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন	
(৮) কল্পনা দত্ত (১৯১৩ – ১৯৯৫)	● ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একতান উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ● ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন	
(৯) মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৬৯/মতান্তর (১৮৭০ – ১৯৪২)	● 'গান্ধিবুড়ি' নামে পরিচিত মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধিজিক মতোই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন ● অসংখ্য মানুষকে একজোট করে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইকে শক্তিশালী করে তোলেন	
(১০) বীরসা মুণ্ডা (১৮৭৫-১৯০০ খ্রি)	● মুণ্ডা বিদ্রোহের নেতা ● মুণ্ডা উপজাতির ওপর ব্রিটিশ সরকারের নানা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন	
(১১) তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি)	● বারাসাত বিদ্রোহের নেতা ● বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন	

(১২) সিধো মুর্মূ (১৮১৫-১৮৫৬ খ্রি)	• সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা • সাঁওতাল উপজাতিদের নানা অধিকার রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন	

মনে রাখা জরুরি :

- ভারতের স্বাধীনতা একটি সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল।
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্ষুদিরাম বসু, কল্পনা দত্ত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণ বির্সজনও দিয়েছেন।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব দেন _____।

(খ) বাঘা যতীন নামে পরিচিত ছিলেন _____।

(গ) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক ছিলেন _____।

(ঘ) গান্ধীবুড়ি নামে পরিচিত ছিলেন _____।

২. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) বিরসা মুণ্ডা কে ছিলেন?

(খ) কে, কেন বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন?

(গ) সূর্য সেন কেন স্মরণীয়?

(ঘ) মাতঙ্গিনী হাজরা কেন স্মরণীয়?

নমুনা প্রশ্নপত্র - ৩

১. **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :**

(ক) ১৫ আগস্ট দিনটিকে কেন আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি?

(খ) সাধারণতন্ত্র দিবস কী?

(গ) কার নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল?

(ঘ) গান্ধি পরিচালিত আন্দোলনের দুটি আদর্শ কী কী?

(ঙ) কোন দিনটিকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করি?

(চ) 'সত্যাগ্রহ' কী?

(ছ) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এমন দুজন নারীর নাম লেখো।

(জ) অরণ্য সপ্তাহতে আমরা কোন কোন কাজ করে থাকি?

(ঝ) পশ্চিমবঙ্গের দুটি নদীর নাম লেখো।

(ঞ) পশ্চিমবঙ্গের দুটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের নাম লেখো।

২. **ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :**

(ক) সিধো ও কানহুর নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ মোকাবিলা করেছিল ইংরেজ শাসনের।

(খ) ১৪ জুলাই - ২৩ জুলাই অরণ্য সপ্তাহ।

(গ) মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।

(ঘ) মহাত্মা গান্ধি সাধারণ মানুষকে একজোট করেছিলেন।

(ঙ) বিরসা বনভূমিকে বসবাসের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন।

(চ) গান্ধিজি অহিংস পথে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

(ছ) ইংরেজ ও স্থানীয় জমিদারদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তিতুমির।

(জ) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের অংশ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া।

(ঝ) হুগলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কলকাতা শহর।

(ঞ) গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে দার্জিলিং, কালিম্পং।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) আজাদ হিন্দ ফৌজ বানিয়েছিলেন _____।

(খ) 'গান্ধিবুড়ি' নামে পরিচিত _____।

(গ) 'বাঁশের কেল্লা' বানিয়েছিলেন _____।

(ঘ) বিশ্ব পরিবেশ দিবস _____।

(ঙ) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী _____।

৪. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক - স্তম্ভ	**খ - স্তম্ভ**
সাঁওতাল হুল	বিরসা
মুণ্ডা উলগুলান	তিতুমির
বারাসাত বিদ্রোহ	সিধো ও কানহু

পঠন সেতু-র বিষয় প্রসঙ্গে

- সপ্তম শ্রেণির ব্রিজ মেটিরিয়ালটিতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যসূচির অনেকগুলি বিষয়কে নেওয়া হয়েছে।
- সপ্তম শ্রেণির পঠন সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলত দুটি ভাবনা স্থান পেয়েছে—সংযোগরক্ষাকারী বিষয় ও মৌলিক বিষয়।
- পঞ্চম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গের রূপরেখা, নগরায়নের মতো কয়েকটি বিষয় সংযোগরক্ষাকারী বিষয় হিসেবে পঠন সেতুতে স্থান পেয়েছে।
- আবার ষষ্ঠ শ্রেণির প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান, ভারত ও বহির্বিশ্বের মতো বিষয়গুলিও ব্রিজ মেটিরিয়ালে দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণির বৈদিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক, সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসন-এর মতো কয়েকটি বিষয় মৌলিক বিষয় হিসেবেও ব্রিজ মেটিরিয়ালে রাখা হয়েছে।
- নমুনা প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের কথা ভেবে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণির ধরনকে সরাসরি অনুসরণ করা হয়নি।

পঠন সেতু

পরিবেশ ও ভূগোল

সপ্তম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদনা ও বিন্যাস

অনিন্দিতা দে

বিষয় নির্মাণ

অম্লান মজুমদার
সুরজিৎ ভট্টাচার্য

সুমন কুমার মাইতি
সৌভিক ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	মহাকাশে পৃথিবী ও তার আবর্তন	1
2.	পৃথিবীর কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়	8
3.	বায়ুচাপ	12
	নমুনা প্রশ্নপত্র ১	15
4.	শিলা ও মাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়	17
5.	নদীর প্রাথমিক ধারণা	20
6.	জলদূষণ ও মাটিদূষণের সাধারণ ধারণা	24
	নমুনা প্রশ্নপত্র ২	30
7.	এশিয়া মহাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	32
8.	আফ্রিকা মহাদেশের সাধারণ পরিচিতি	41
	নমুনা প্রশ্নপত্র ৩	50

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 মহাকাশে পৃথিবী ও তার আবর্তন

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মহাকাশ, ছায়াপথ, নীহারিকা, সূর্য ও তার গ্রহ পরিবার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বর্ণনা করতে পারবে।
- সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও জোয়ার-ভাটার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- পৃথিবীর অভিগত গোলক আকারের বৈশিষ্ট্য এবং পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীরই মতো — কথাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পৃথিবীর আবর্তন গতি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা, স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

ছায়াপথে সূর্য, পৃথিবী এবং পৃথিবীর আকৃতি

বিরাট মহাকাশে আছে কোটি কোটি ছায়াপথ, যার ভিতরে রয়েছে অজস্র নীহারিকা, আর নীহারিকাগুলোর ভিতরে জন্ম নেয় হাজার হাজার নক্ষত্র। নক্ষত্রদের ঘিরে ঘুরছে গ্রহ আর গ্রহের চারিদিকে ঘুরছে উপগ্রহরা।

ছায়াপথ

আকাশগঙ্গা বা মিল্কিওয়ে ছায়াপথের একটা নক্ষত্র হল সূর্য। তার গ্রহপরিবারে রয়েছে আমাদের পৃথিবী। রাতের আকাশে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে বোঝা যায়, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সাদা ছায়ার মতো একটা পথ জেগে আছে। ওই পথ হল আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথেরই একটা অংশ।

ছায়াপথে নক্ষত্রগুলো আছে অনেক দূরে দূরে। আলো এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিমি পথ পেরিয়ে যায়। তাহলে এক বছরে সে পার হয় ৩ লক্ষ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ কিমি। এই বিরাট দূরত্বকে বলে এক আলোকবর্ষ। সূর্যের সবথেকে কাছের নক্ষত্র প্রক্সিমা সেনটাউরি চার আলোকবর্ষেরও বেশি দূরে রয়েছে। তাহলে ভাবো, গোটা মহাকাশটা কত বড়ো!

সপ্তর্ষিমণ্ডল

পৃথিবী থেকে যে তারাগুলিকে কাছাকাছি দেখি, তাদের নানা কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে সিংহ, কাঁকড়া, দাঁড়িপাল্লা, মাছ প্রভৃতি আকৃতি পাওয়া যায়। এদের বলে নক্ষত্রমণ্ডল বা কনস্টেলেশন। এছাড়া আছে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো 'সপ্তর্ষিমণ্ডল', W অক্ষরের মতো 'ক্যাসিওপিয়া' অথবা শিকারী মানুষের মতো 'কালপুরুষ'। সপ্তর্ষিমণ্ডল আর কালপুরুষ আকাশে সহজেই চিনতে পারবে তোমরা।

সূর্য পৃথিবীর থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। তার বাইরের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াস, কিন্তু কেন্দ্রে প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেখানে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাস প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে যুক্ত হয়ে তৈরি

করে চলেছে বিপুল পরিমাণ তাপ ও আলো। সূর্যের মতো মাঝারি হলুদ নক্ষত্রদের আয়ু মোটামুটি এক হাজার কোটি বছর। তারপর জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে তারা নিভে যায়। সূর্যের বয়স এখন প্রায় পাঁচশো কোটি। সূর্যের গায়ে কোথাও কোথাও তাপমাত্রা একটু কম— যেগুলোকে কালো ছোপের মতো দেখায়। এদের বলে সৌরকলঙ্ক। এগারো বছর পরপর সূর্যের গায়ে এই কালো দাগগুলো বেড়ে যায়, তখন আবার সূর্য বেশি গরম হয় ও তাতে ছোটো ছোটো বিস্ফোরণ হতে থাকে। এর নাম **সৌরঝড়**। সৌরঝড় বেশি হলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কৃত্রিম উপগ্রহগুলোতে নানা গোলযোগ দেখা দেয়।

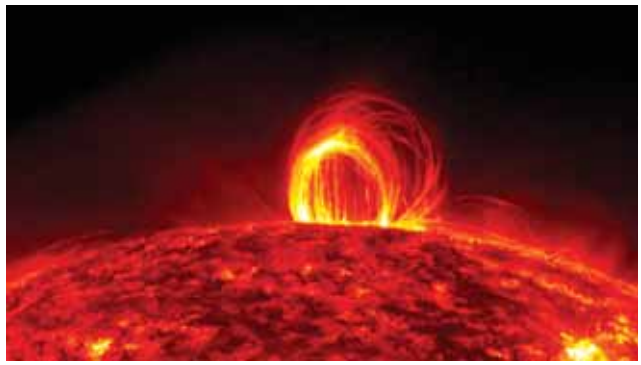

সৌরঝড়

খালি চোখে কখনো সূর্যের দিকে তাকিও না। ওইভাবে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর চোখের খুব ক্ষতি হয়েছিল।

আটটা গ্রহ, পাঁচটা বামন গ্রহ, তাদের উপগ্রহসমূহ, এছাড়া উল্কা, ধূমকেতু ও অনেক গ্রহাণু নিয়ে আমাদের সূর্যের পরিবার। বৃহস্পতি সবথেকে বড়ো গ্রহ, বুধ সবথেকে ছোটো। শুক্র সবথেকে উত্তপ্ত, পৃথিবীর সবথেকে কাছে। সামনের চারটে গ্রহ (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল) ছোটো এবং পাথুরে, পিছনের চারটে গ্রহ বড়ো এবং জমাট গ্যাস দিয়ে তৈরি (বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন)। বড়ো গ্যাসীয় গ্রহগুলির প্রত্যেকেরই আছে বলয়, তবে শনির বলয় সবচেয়ে বড়ো ও সুন্দর।

রকেটে চেপে পৃথিবী থেকে প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন ১৯৬১ সালে ইউরি গ্যাগারিন। এরপর ১৯৬৯ সালে নিল আর্মস্ট্রং ও এডুইন অলড্রিন প্রথম চাঁদের মাটি স্পর্শ করেন। ভারত থেকে প্রথম মহাকাশে যান রাকেশ শর্মা, পরে কল্পনা চাওলা। ভারতের মহাকাশ গবেষণা-সংস্থা Indian Space Research Organization (ISRO) ইতিমধ্যে চন্দ্রায়ন-I ও চন্দ্রায়ন - II মহাকাশে পাঠিয়েছে।

চাঁদ পৃথিবীর খুবই কাছে রয়েছে বলে কখনো চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে। তখন তাকে বলে সূর্যগ্রহণ। আবার কখনো পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে ঢেকে দেয়। তখন হয় **চন্দ্রগ্রহণ**। কোনো কোনো অমাবস্যার দিন সূর্যগ্রহণ ও কোনো কোনো পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ঘটে। চন্দ্র-সূর্যের মহাকর্ষের টানে পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সমুদ্র উপকূলে এবং নদী মোহনায় জল বৃদ্ধি পায়। একে বলে জোয়ার। জল কমে যাওয়ার ঘটনা দেখা যায় দুটি জোয়ারের মাঝখানে। এর নাম ভাটা।

আগেকার দিনে মানুষ ভাবত পৃথিবী বুঝি সমতল, কোনো এক কিনারায় গিয়ে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে পরোক্ষ বিভিন্ন ভাবনা থেকে আমরা প্রথমে বুঝতে পারলাম, পৃথিবী আসলে ফুটবলের মতো গোলক আকৃতিবিশিষ্ট। পরে আরো সঠিক গণনায় জানা গেল, ফুটবলের মতো পুরোপুরি গোলক নয়, বরং কমলালেবুর মতো, একটু ওপরে-নীচে চাপা গোলক আকৃতি। একে বলে **অভিগত গোলক**। কিন্তু এখন আমরা আরো সঠিকভাবে জানি, পৃথিবীর উত্তরমেরু একটু উঁচু, দক্ষিণমেরু একটু নীচু এবং এবং উত্তর দিকের মাঝখানের অংশ আবার একটু নীচু এবং দক্ষিণ দিকের মাঝখানের অংশ খানিকটা উঁচু। পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া এভারেস্ট প্রায় ৯ কিমি উঁচু এবং গভীরতম স্থান মারিয়ানা খাত প্রায় ১১ কিমি গভীর। ফলে, সব মিলিয়ে কিছুটা নাসপাতির মতো হলেও শেষ বিচারে, পৃথিবীর সাথে তুলনা করা যায়— এমন কোনো নিখুঁত উদাহরণ কোথাও নেই। তাই আজকাল আমরা বলি, পৃথিবীর আকৃতি ঠিক পৃথিবীরই মতো, অতুলনীয়।

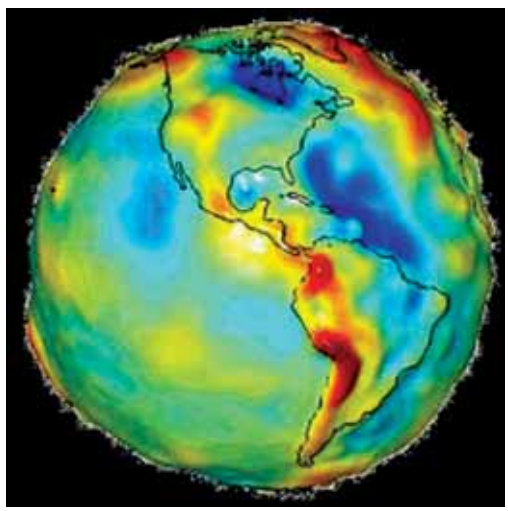

পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীরই মতো

✸ **নীচের ছকে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো।**

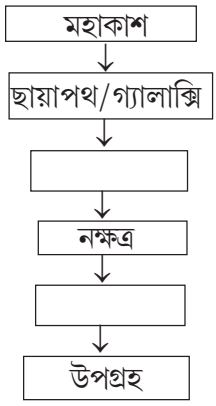

✸ **বাক্স-১ ও বাক্স-২ -তে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথি অনুযায়ী চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের অবস্থান দেখাও। কোন ক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ ও কোন ক্ষেত্রে চন্দ্রগ্রহণ হবে সেটা লেখো।**

বাক্স-১

_____ _____ _____

_____ (অমাবস্যা / পূর্ণিমা)

বাক্স-২

_____ _____ _____

_____ (অমাবস্যা / পূর্ণিমা)

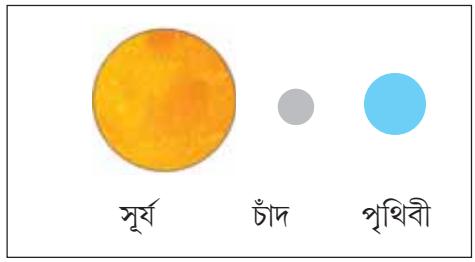

পৃথিবীর আবর্তন

আগেকার দিনে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষের যেমন ভুল ধারণা হত যে পৃথিবী সমতল, সেইরকমই আরেকটা ভুল ধারণা জন্মাত আকাশে তাকিয়ে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র— সবই পূর্বদিকে ওঠে আর পশ্চিমে অস্ত যায়। ফলে তখন মানুষ ভাবত, পৃথিবী স্থির এবং তাকে ঘিরে সমস্ত গ্রহ-তারা পরিক্রমা করে চলেছে।

ছায়াবৃত্ত

এখন আমরা জানতে পেরেছি, পৃথিবী নিজেই লাট্টুর মতো পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে নিজের অক্ষের চারিদিকে আবর্তন করে চলেছে। সেইজন্যই সূর্য পূর্বদিকে উঠছে আর পশ্চিমদিকে অস্ত যাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর একদিকে হচ্ছে দিন আর অন্যদিকে রাত্রি এবং দিন ও রাতের মিলনরেখা বরাবর জেগে থাকছে আবছা আলোমাখা ছায়াবৃত্ত। এর অর্ধেকটা অংশ হলো ভোরের আলো আর বাকি অর্ধেকটা গোধূলি।

চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা যায় গাছ, বাড়ি, ইলেকট্রিক পোস্ট সবই ছুটে চলেছে ট্রেনের বিপরীত দিকে। আসলে, ট্রেনটা সামনের দিকে এগোয় বলেই ওইরকম ভুল ধারণা হয়। ভোর থেকে সন্ধে

পর্যন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রতিদিন সূর্যের যে চলাচল, সেটা ওই ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যের মতো। আসলে পৃথিবীই ঘুরে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। সূর্যের এই গতিকে বলে **সূর্যের আপাত দৈনিক গতি**।

লাট্টু যে সুঁচালো পেরেকটার ওপর ঘোরে, সেটা তার মেরুদণ্ড বা অক্ষ। পৃথিবী যেহেতু লাট্টুর মতোই ঘুরছে, তাই তার মাঝখান দিয়েও একটা মেরুদণ্ড কল্পনা করা যায়। সেটাই হলো পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষ।

লাট্টু

পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন

এবার লাট্টুর ঘূর্ণনটা ভালো করে লক্ষ করো। লাট্টুর মাঝখানটা বেশ মোটাসোটা, অক্ষ থেকে ওই অংশ বেশ খানিকটা দূরে, তাই বড়ো একটা বৃত্তপথে সে ঘুরতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু লাট্টুর ওপরের বা নীচের দিকটা বেশ সরু, ফলে মেরুদণ্ড থেকে খুব দূরে নয়। তাই একদম ওপরের এবং নীচের ওই অংশ ঘুরছে খুব ছোটো বৃত্তপথে, অর্থাৎ রাস্তাটা অনেক কম। অথচ একবার আবর্তন করতে মোটা ও সরু অংশের একই সময় লাগছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, লাট্টুর মাঝের অংশটা বেশি দ্রুত ঘুরছে এবং তার উপর ও নীচের অংশ ঘুরছে ধীরে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ছবিটা এবার ভালো করে দেখো। ঠিক মাঝখানে অর্থাৎ নিরক্ষরেখায় ঘূর্ণন গতি সবথেকে বেশি। সুমেরুবিন্দু আর কুমেরুবিন্দু, যেখান দিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণন-অক্ষ বা মেরুদণ্ডটা ফুঁড়ে বেরিয়েছে, সেখানে ঘূর্ণন গতি সবথেকে কম। প্রায় শূন্যই বলা চলে। আশ্চর্য হলেও এটা সত্যি।

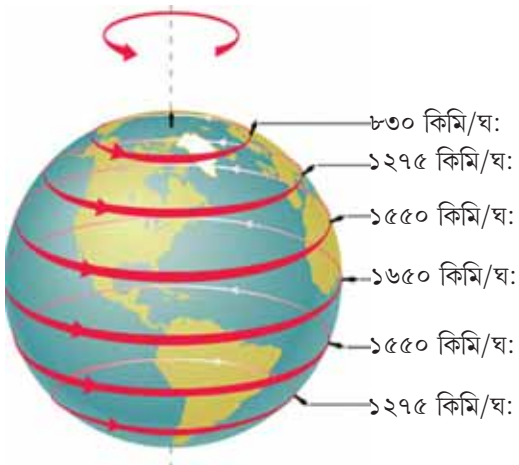

✸ বলোতো কোথায় পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সবচেয়ে কম?

তোমরা জানো, একটা দিন আর রাত মিলিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা। পৃথিবীর পুরো একবার আবর্তন। কিন্তু একটা ঘণ্টা কেটে গেল— এটা নিখুঁতভাবে বুঝব কীভাবে! এখন না হয় ঘড়ি দেখে নিচ্ছি, কিন্তু যখন ঘড়ি ছিল না?

সূর্য বা চাঁদের আলোয় লম্বাটে বস্তু, যেমন - স্তম্ভ বা নারকেল গাছ প্রভৃতির ছায়া মাটিতে পড়ে। সকালে এবং বিকেলে সূর্য দিগন্তে, যেখানে আকাশ আর ভূমি মিলেছে, তার কাছাকাছি থাকে। ফলে সবকিছুরই ছায়া খুব লম্বা হয়। কিন্তু দুপুরবেলা সূর্য যখন মাথার ওপর, তখন ছায়া প্রায় থাকেই না। তাই ছায়ার দৈর্ঘ্য বারবার দেখে অথবা মেপে অনেকটা সঠিকভাবে বলে দেওয়া যায় সূর্য বা চন্দ্রের উদয়ের পর কত ঘণ্টা কেটেছে। আগেকার দিনে বয়স্ক মানুষেরা এভাবেই ঘড়ি না দেখেই কটা বাজে বলে দিতে পারতেন। এইভাবেই আমরা পেয়েছি সূর্যঘড়ি আর চন্দ্রঘড়ির নানারকম বৈচিত্র্য। এছাড়াও আগেকার দিনে সময় মাপার জন্য জলঘড়ি, বালিঘড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে কোনো পাত্র জল বা বালিতে ভর্তি হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমেও সময় বোঝা যেত। তবে সেগুলো ব্যবহার করা ছিল খুব অসুবিধাজনক।

সময় আর তারিখ নিয়ে সমস্যা

একটা ফুটবলের একপাশে মোম জ্বালালে ফুটবলের অর্ধেক অংশে আলো পড়বে, বাকি অর্ধেক থাকবে অন্ধকারে। মোমের মতোই সূর্য পৃথিবীর ফুটবলটার একপাশ আলোকিত করছে। সেই অংশটা দিন, উল্টোদিকে রাত।

এখন ফুটবলটা যদি লাট্টুর মতো ঘুরতে শুরু করে, তাহলে দেখবে একদিকে ক্রমাগত নতুন অংশ অন্ধকার থেকে আলোয় আসছে (অর্থাৎ, ভোর হচ্ছে) এবং অন্যদিকে আরেক অংশ আলো থেকে অন্ধকারে চলে যাচ্ছে (অর্থাৎ, রাত হচ্ছে)। এথেকে সহজেই বোঝা যায়, পৃথিবীর একদিকে যখন ভোর হয়, অন্যদিকে তখন সন্ধ্যা নেমে আসে। এক অংশে যখন বেলা দুপুর, অন্য অংশে তখন গভীর রাত। এক-এক স্থানের 'সময়' এক-এক রকম। একেই বলে 'স্থানীয় সময়'। সূর্য যখন কোনো স্থানে ঠিক মাথার ওপর, তখন সেই মুহূর্তকে বেলা ১২টা ধরে নিয়ে পরের দিন আবার বেলা ১২টা হওয়া পর্যন্ত সময়কে ২৪ ঘণ্টা ধরা হয়। এই সময়কে সমান ২৪ ভাগে ভেঙ্গে স্থানীয় সময়ের হিসেব রাখা খুব কঠিন নয়। সূর্যঘড়িতে লম্বা বস্তুর ছায়ার সাহায্যে স্থানীয় সময় সহজেই মাপা যায়। রাতে একইভাবে কাজে আসবে চন্দ্রঘড়ি।

মোমের আলোয় ঘুরন্ত ফুটবল দেখে আমরা আগেই বুঝেছি, পৃথিবীর যেখানে সকাল হচ্ছে, পাশাপাশি ঠিক অর্ধেকটা সরে এলে যেখানে পৌঁছব, সেখানে তখনি হচ্ছে সন্ধ্যা। তাহলে, কোনো দেশ পাশাপাশি কিছুটা চওড়া হলেই তার পূর্ব সীমানার সাথে পশ্চিম সীমানার স্থানীয় সময়ে যথেষ্ট তফাৎ হবে। সেক্ষত্রে দেশব্যাপী কোনো পরীক্ষা, দূরদর্শনে কোনো অনুষ্ঠান প্রচার প্রভৃতির ব্যাপারে সময় নিয়ে খুবই গণ্ডগোল দেখা দেবে। কারণ, দেশের এক এক স্থানে এক-এক রকম স্থানীয় সময়। এই সমস্যা সহজভাবে সমাধানের একটাই রাস্তা। দেশের ঠিক মাঝখানের অংশে যা **স্থানীয় সময়** আছে, সেটাকেই সেই মুহূর্তে সারা দেশের সময় বলে মেনে নিতে হবে। ডানদিকে বা পূর্বদিকের স্থানীয় সময় তার থেকে এগিয়ে থাকবে এবং পশ্চিম অথবা বাঁ দিকের স্থানীয় সময় পিছিয়ে থাকবে। কিন্তু ওইসব স্থানীয় সময় (যা ওইসব স্থানে সূর্য/চন্দ্র ঘড়িতে ছায়া মেপে পাব) উপেক্ষা করে আমরা দেশের মাঝখানের স্থানীয় সময়টাকেই সারা দেশের সময় বলে মেনে নেব। কাজকর্মের সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া এই সময়টাকে বলে **প্রমাণ সময়**।

কিন্তু একটা নতুন দিন সকলের আগে অথবা সকলের শেষে কোথায় শুরু হবে? যত বেশি পূর্বদিকে যাব, তত আগে আগে সকাল হবে, আর যত বেশি পশ্চিমে যাব, তত দেরি করে সকাল পাব। এখন, পৃথিবী যেহেতু একটা গোলক, তাই পৃথিবীর যে স্থান থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে যাওয়া শুরু হয় (০° দ্রাঘিমা বা মূলমধ্যরেখা,) সেই স্থান থেকে ঠিক অর্ধেকটা ডানদিকে গেলে যে ১৮০° দ্রাঘিমা পাওয়া যায়, সেটাই হল সবচেয়ে পূর্বদিক। আবার, অর্ধেকটা পথ বাঁদিকে গেলে ওই রেখাটিই হয়ে যায় চরম পশ্চিমদিক। তাই, ১৮০° দ্রাঘিমাটিকে অনুসরণ করে একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে, যার একপাশে পুরনো দিনটা সবশেষে শুরু হচ্ছে, আর ঠিক অন্যপাশে নতুন দিনটা শুরু হচ্ছে সবার আগে। একই আকাশে একই সূর্যোদয়— দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তা দেখছে, অথচ একজনের তারিখ ১লা জানুয়ারি হলে অন্যজনের ২রা জানুয়ারি— একেবারে ২৪ ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য। কারণ, তাদের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে ওই কাল্পনিক রেখাটি। সঠিক কারণেই তার নাম রাখা হয়েছে **আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা**।

আন্তর্জাতিক তারিখরেখা

বুঝতেই পারছ, কোনো দেশের মধ্য দিয়ে এই রেখাটা গেলে তারিখ নিয়ে মহা গণ্ডগোল বেঁধে যাবে। সেইজন্যই এই রেখা কোথাও কোথাও বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রেখাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জলের মধ্য দিয়ে, যাতে কারো কোনো অসুবিধা না হয়।

পৃথিবীর পরিক্রমণ

পৃথিবী যে শুধু নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্তন করে (দৈনিক বা আহ্নিক গতি) তা নয়, অন্য গ্রহগুলোর মতো একই সাথে সে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমাও করে (বার্ষিক গতি) কিছুটা হেলে-থাকা অবস্থায়। ফলে দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য কম-বেশি হতে থাকে, দেখা দেয় ঋতু পরিবর্তন। কোথাও আবার দীর্ঘ ছয় মাস ধরে একটানা দিন হয়, তারপর আবার একটানা ছয় মাস চলে রাত।

মনে রাখা জরুরি :

- **ছায়াপথ** — যেখানে অজস্র নক্ষত্র দল বেঁধে থাকে।
- **নীহারিকা** — যেখানে অনেক নক্ষত্রের জন্ম হয়।
- **আকাশগঙ্গা ছায়াপথ** — যে ছায়াপথে সূর্য রয়েছে।
- **সূর্যগ্রহণ** — পৃথিবীতে চাঁদের ছায়ার পতন।
- **চন্দ্রগ্রহণ** — চাঁদে পৃথিবীর ছায়ার পতন।
- **অভিগত গোলক** — উত্তর-দক্ষিণ চাপা একটি গোলক।
- **আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা** — ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অনুসরণকারী কাল্পনিক যে রেখার একপাশে একটি দিন সবার শেষে এবং অন্যপাশে তারপরের দিনটি সবার আগে শুরু হয়।
- **ছায়াবৃত্ত** — দিন ও রাত্রির বৃত্তাকৃতি মিলনরেখা।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির 'পৃথিবীর পরিক্রমণ' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তন করলে যে দিকে সূর্য উঠত —

(ক) পূর্ব (খ) পশ্চিম (গ) উত্তর (ঘ) দক্ষিণ।

১.২ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা যে দ্রাঘিমা অবলম্বনে আঁকা হয়েছে, তার মান হলো —

(ক) ০° (খ) ৯০° (গ) ১৮০° (ঘ) ৩৬০°।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ সূর্যের সবচেয়ে কাছে যে নক্ষত্র, তার নাম_____।

২.১.২ সূর্যের আলোয় লম্বা বস্তুর ছায়া মেপে যে ঘড়িতে সময় মাপে, তার নাম_____।

২.২ বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ নীহারিকার মধ্যে অনেক নক্ষত্রের জন্ম হয়।

২.২.২ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার দুপাশে সময় পার্থক্য হয় ঘণ্টা।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ পৃথিবীর আকৃতি অভিগত গোলকের মতো কেন বলা হয়?

২.৩.২ স্থানীয় সময় কোন ঘড়িতে মাপা যায়?

২.৪ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ	
২.৪.১	আকাশ গঙ্গা	১.	আবর্তন গতি
২.৪.২	জোয়ার ভাটা	২.	শুক্র
২.৪.৩	অক্ষ	৪.	চাঁদের মহাকর্ষ
২.৪.৪	পাথুরে গ্রহ	৪.	ছায়াপথ

৩. নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ ছায়াপথ কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীরই মতো কেন বলা হয়?

৪.২ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার দুদিকে দুটি দিন কীভাবে হয় ব্যাখ্যা করো।

2 পৃথিবীর কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।
- ভূ-গোলকে বা গ্লোবে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা চিহ্নিত করতে পারবে।
- গ্লোবের উপর নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখা চিহ্নিত করতে পারবে ও গোলার্ধ নির্ণয় করতে পারবে।
- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।
- পৃথিবীর উপর অবস্থিত কোনো একটি স্থান ভূ-গোলকের ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত তা নির্ণয় করতে পারবে।

ভূগোলে 'অবস্থান' শব্দটি ভূপৃষ্ঠের উপর কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকাকে বোঝাতে বা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সমতল ক্ষেত্রের উপর কোনো স্থানের অবস্থান বোঝাতে অন্য কোনো স্থানের সাপেক্ষে তার অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। যেমন— যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার স্কুল কোথায় অবস্থিত? তুমি উত্তর দিতে পারো যে তোমার স্কুল তোমার বাড়ির থেকে পূর্বদিকে ১ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। কিন্তু গোলাকৃতি ভূপৃষ্ঠের উপর এইভাবে অবস্থান বলা বা নির্ণয় করার অসুবিধা আছে। তাই, ভৌগোলিকরা পৃথিবীর উপর কতগুলি রেখা কল্পনা করে এই রেখাগুলির ছেদবিন্দুর সাহায্যে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

তোমরা গ্লোব শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, গ্লোব বা ভূ-গোলক হলো পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। তোমরা যদি একটি গ্লোবকে ভালো করে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে গ্লোবের উপর আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বিভাবে কয়েকটি রেখা টানা আছে। এই রেখাগুলির সাহায্যেই গোলকাকৃতির ভূপৃষ্ঠের উপর কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এই রেখাগুলি ভূ-গোলকের গায়ে পরস্পর ছেদ করে যে জালিকাকার বিন্যাস তৈরি করে তাকে ভূজালক বলে।

গ্লোব

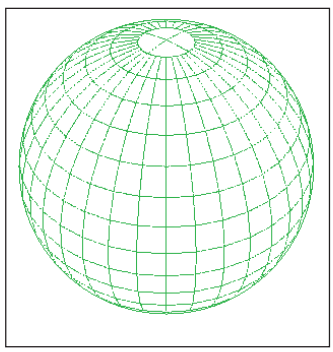

ভূজালক

ভূ-গোলকের উত্তরতম বিন্দুটি উত্তর মেরু এবং দক্ষিণতম বিন্দুটি হল দক্ষিণ মেরু। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীর মাঝ বরাবর গোলাকার রেখাটি হল **নিরক্ষরেখা**, যার মান ০°।

গ্লোবটি ভালো করে লক্ষ করলে তোমরা দেখবে যে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী অর্ধবৃত্তাকৃতি একটি রেখা পৃথিবীর মাঝ বরাবর টানা হয়েছে, এই রেখাটি হল **মূলমধ্যরেখা**।

নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে দুটি অংশে ভাগ করেছে, নিরক্ষরেখার উত্তরদিকের অংশটি হলো — উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের অংশটি হল দক্ষিণ গোলার্ধ। মূলমধ্যরেখা পূর্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে, মূলমধ্যরেখার পূর্ব দিকের অংশটি হল পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিমদিকের অংশটি হল পশ্চিম গোলার্ধ।

নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখার সাহায্যে আমরা তাহলে পৃথিবীর কোনো একটি স্থান কোন গোলার্ধে অবস্থিত তা চিহ্নিত করতে পারি।

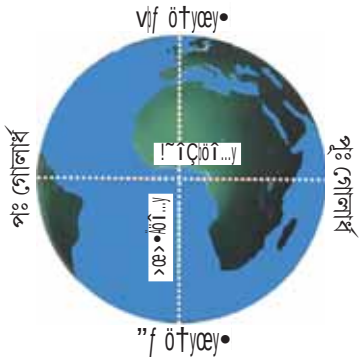

✸ একটি গ্লোব বা পৃথিবীর মানচিত্র দেখে নীচের তালিকাতে উল্লিখিত দেশগুলি কোন গোলার্ধে অবস্থিত তা লেখো।

দেশের নাম	গোলার্ধ
১) ভারত	
২) ইংল্যান্ড	
৩) আর্জেন্টিনা	
৪) অস্ট্রেলিয়া	
৫) কানাডা	

নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে নিরক্ষরেখার সঙ্গে সমান্তরালে কতগুলি গোলাকৃতি কাল্পনিক রেখা আঁকা হয়। এই রেখাগুলি হলো অক্ষরেখা। নিরক্ষরেখা থেকে প্রত্যেক ১° অন্তর উত্তরে ও দক্ষিণে ৭৯টি করে মোট ১৭৯টি (নিরক্ষরেখাসহ) অক্ষরেখা আঁকা যায়।

আবার মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু সংযোগকারী যে অর্ধবৃত্তাকৃতি রেখাগুলি টানা হয়েছে, সেগুলি হলো দ্রাঘিমারেখা। মূলমধ্যরেখা রেখার মানকে ০° ধরে ১° অন্তর মোট ৩৬০টি (মূলমধ্যরেখাসহ) দ্রাঘিমারেখা আঁকা যায়।

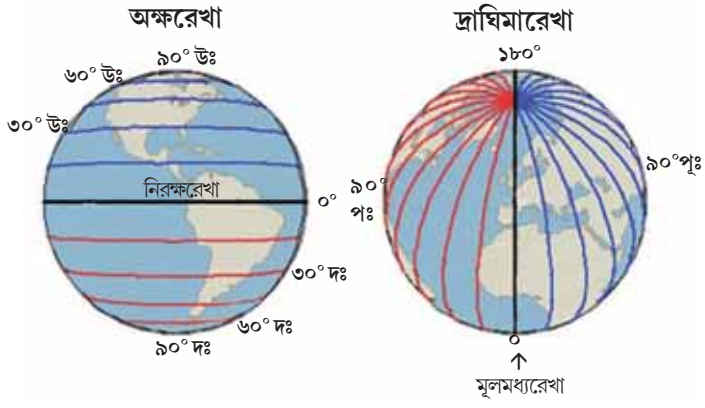

তোমরা পৃথিবীর মানচিত্র লক্ষ করলে দেখবে যে, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলি গ্লোবের উপর একে অপরকে ছেদ করে একটি জালের মতো বিন্যাস তৈরি করেছে। কোনো একটি স্থানের অবস্থান ভূ-গোলকের উপর নির্ণয় করতে হলে ভৌগোলিকরা অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার এই ছেদবিন্দু সাহায্য নেন, নীচের ছবিতে বিষয়টি বোঝানো হলো—

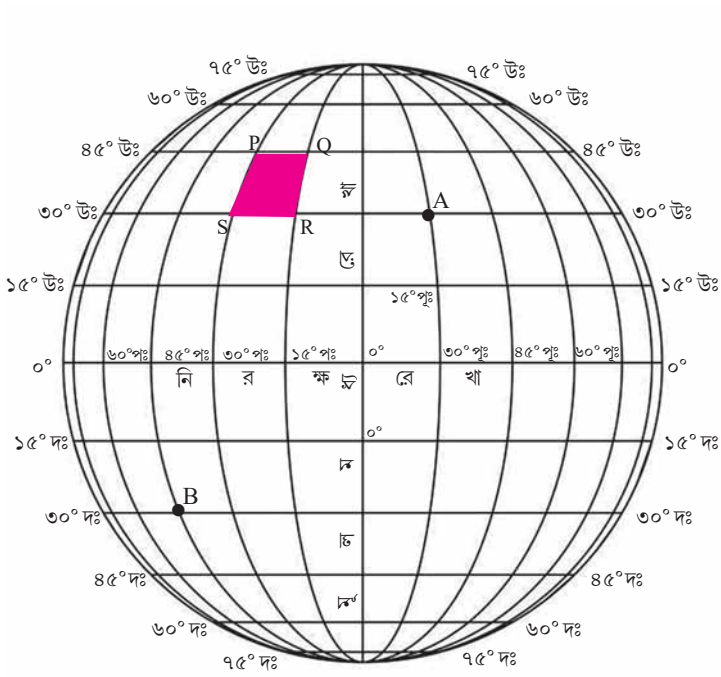

ভূজালকের সাহায্যে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়

উপরের ছবিতে A ও B স্থানটির অবস্থান ঐ স্থান দুটির উপর দিয়ে যে দুটি অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাকে ছেদ করেছে, তাদের মানের সাহায্যে ভূ-গোলকে স্থান দুটির সঠিক অবস্থান বলা সম্ভব।

যেমন — A স্থানের অবস্থান ৩০° উত্তর ও ১৫° পূর্ব এবং B স্থানের অবস্থান ৩০° দক্ষিণ ও ৪৫° পশ্চিম।

ভূ-গোলকে কোনো বড়ো স্থানের অবস্থান জানতে হলে ওই স্থানটির সীমানা যে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা দ্বারা সীমিত, তাদের মানের দ্বারা নির্ণয় করা হয়। যেমন— ওপরের চিত্রে PQRS স্থানটির অবস্থান হলো— ৩০° উত্তর থেকে ৪৫° উত্তর এবং ১৫° পশ্চিম থেকে ৩০° পশ্চিম।

কোনো একটি স্থান যে নির্দিষ্ট অক্ষরেখার উপর অবস্থিত, সেই অক্ষরেখার মানের সাহায্যে সেই স্থানটির অক্ষাংশ নির্ধারণ করা হয় এবং সেই স্থানের উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমারেখা আঁকা হয়েছে তার মানের সাহায্যে সেই স্থানটির দ্রাঘিমা নির্ধারণ করা হয়। অক্ষাংশ হলো নিরক্ষীয় তলের সাথে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব এবং দ্রাঘিমা হলো মূলমধ্যরেখার তলের সঙ্গে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব। যেমন — কোনো স্থানের অবস্থান যদি ১৫° উত্তর ও ৩৫° পূর্ব হয় তাহলে এক্ষেত্রে স্থানটির অক্ষাংশ হল ১৫° উত্তর ও দ্রাঘিমা হলো ৩৫° পূর্ব।

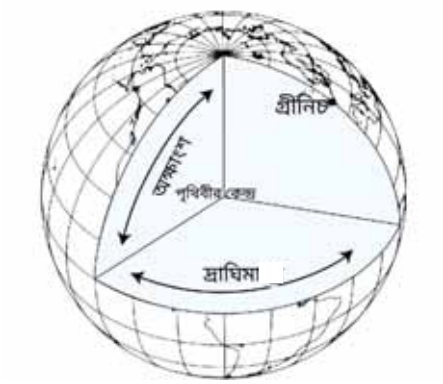

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা

মনে রাখা জরুরি :

- **অবস্থান** — ভূ-গোলকের উপর কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকা।
- **গ্লোব** — গ্লোব বা ভূ-গোলক হলো পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।
- **অক্ষাংশ** — নিরক্ষরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থান নিরক্ষরেখার তল থেকে যে কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে।
- **দ্রাঘিমা** — মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত কোনো স্থান মূলমধ্যরেখার তল থেকে যে কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেনির 'ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :**

১.১ কোনো একটি স্থানের অক্ষাংশ ১২° উঃ হলে স্থানটি যে গোলার্ধে অবস্থিত তা হলো —

(ক) পূর্ব (খ) দক্ষিণ (গ) উত্তর (ঘ) পশ্চিম।

১.২ নিরক্ষরেখা বাদে ভূ-গোলকে অঙ্কিত ১° অন্তর মোট অক্ষরেখার সংখ্যা হলো —

(ক) ১৭৯টি (খ) ১৭৮টি (গ) ১৮০টি (ঘ) ১৮১টি।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ **উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

২.১.১ মূলমধ্যরেখা বাদে ১° অন্তর ভূ-গোলকে অঙ্কিত দ্রাঘিমারেখার সংখ্যা _____।

২.১.২ ভারত পৃথিবীর _____ গোলার্ধে অবস্থিত।

২.২ **বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :**

২.২.১ দ্রাঘিমা মূলমধ্যরেখার তলের সাপেক্ষে নির্ণয় করা হয়।

২.২.২ নিরক্ষরেখার মান ১০° উঃ।

২.৩ **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ ০°	১. অক্ষাংশ
২.৩.২ ২৫° দক্ষিণ	২. দ্রাঘিমারেখার সংখ্যা
২.৩.৩ ৩৬০	৩. মূলমধ্যরেখা

২.৪. **একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :**

২.৪.১ পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিরূপকে এক কথায় কী বলা হয়?

২.৪.২ ভূ-গোলকে অবস্থিত কোনো স্থান বা এলাকাকে চিহ্নিত করতে এককথায় কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৩.১ অক্ষাংশ বলতে কী বোঝো?

৩.২ মূলমধ্যরেখার গুরুত্ব উল্লেখ করো।

৩.৩ অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

3 বায়ুচাপ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- বায়ুর চাপ কাকে বলে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পৃথিবীর উপর সর্বত্র বায়ুর চাপ একরকম হয় না কেন তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

এক গ্লাস জলের উপর একটা পোস্টকার্ড চাপা দিয়ে গ্লাসটিকে উপুড় করে ধরলে আমরা দেখব এক ফোঁটা জলও পড়ছে না। অতটা জলের চাপ একটা সামান্য পোস্টকার্ড কীভাবে ধরে রাখছে! আসলে, পোস্টকার্ডটা কিছুই করছে না, পোস্টকার্ডটাকে গ্লাসের মুখে আটকে রাখছে বায়ুর চাপ।

আবার যদি একটা খালি কাঁচের বোতলে দুটো দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ফেলে দেওয়া হয় এবং আগুন নিভে যাওয়ার পরে বোতলের মুখে একটা খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে ধীরে ধীরে ডিমটা বোতলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। ম্যাজিকের মতো দেখতে লাগলেও বায়ুর চাপেই ডিমটা ক্রমশ বোতলের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকে।

পোস্টকার্ডের ক্ষেত্রে কাজ করে বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী চাপ আর ডিমটার ক্ষেত্রে নিম্নমুখী চাপ। আসলে যেকোনো বস্তুর উপর বায়ু সব দিক থেকেই চাপ দেয়।

বায়ুর চাপ কত

পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে যে গ্যাসীয় আবরণ, তাকে বলে বায়ুমণ্ডল। প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মান **১৪.৭ পাউন্ড/বর্গ ইঞ্চি** বা ৪৫° উত্তর অক্ষরেখার সমুদ্রপৃষ্ঠে **১০১৩.২৫ মিলিবার**। বায়ুচাপ মাপা হয় ব্যারোমিটারের সাহায্যে এবং তাতে ৭৬ সেমি পারদস্তম্ভের চাপের সমান হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। কিন্তু বায়ুর চাপ পৃথিবীর সর্বত্র সমান থাকে না। যখন বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর কম চাপ দেয়, তাকে বলে **নিম্নচাপ** ও যখন বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর বেশি চাপ দেয়, তাকে বলে **উচ্চচাপ**।

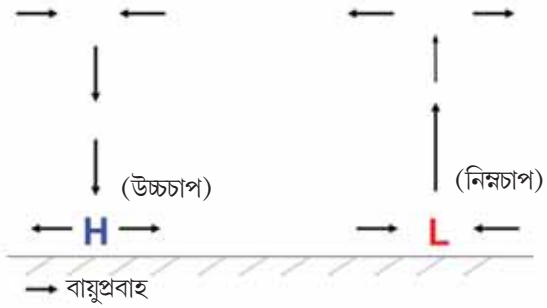

বায়ুচাপ সর্বত্র এক হয় না কেন

যখন কোনো স্থানে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তখন সেখানকার বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় ও ভূপৃষ্ঠে কম চাপ দেয়, ফলে নিম্নচাপ হয়। আবার উষ্ণতা হ্রাস পেলে বায়ু ভারী হয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর বেশি চাপ দেয় ও উচ্চচাপ অনুভূত হয়।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি বা আর্দ্রতা বেশি হলে হয় **নিম্নচাপ**, কারণ আর্দ্র বায়ু শুষ্ক বায়ুর থেকে হালকা। সুতরাং **বায়ুর আর্দ্রতা কম হলে হয় উচ্চচাপ**।

কোনো স্থানের উচ্চতা বেশি হলে সেই স্থানে বায়ুর ঘনত্ব কম হয়। ফলে বায়ু কম চাপ দেয় ও নিম্নচাপ হয়।

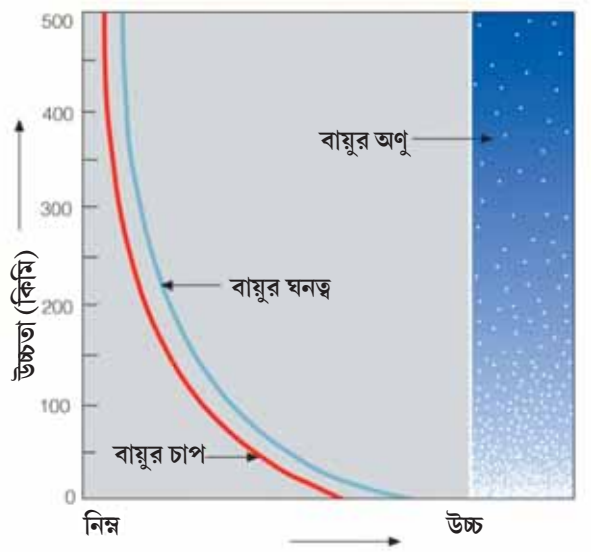

বিশেষ কথা

যখন বায়ুর অণুগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে তখন বায়ুর ঘনত্ব বেশি হয় ও দূরে থাকলে ঘনত্ব কম হয়।

✸ **নিজে করো :**

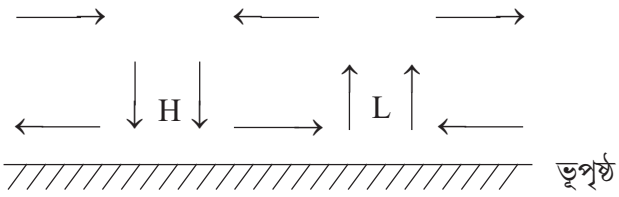

H ও L বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

তিরচিহ্নের (→) দ্বারা কীসের গতিপথ বোঝানো হচ্ছে?

✸ **শূন্যস্থানগুলিকে উপযুক্ত শব্দ (বেশি/কম) দিয়ে ভরাট করো :**

বায়ুর	মাত্রা	বায়ুর চাপ
উষ্ণতা	বেশি	
		বেশি
আর্দ্রতা		বেশি
		কম
উচ্চতা	বেশি	
	কম	

মনে রাখা জরুরি :

- **ব্যারোমিটার** — যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ মাপা হয়।
- **নিম্নচাপ** — যখন বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর কম চাপ দেয়।
- **উচ্চচাপ** — যখন বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর বেশি চাপ দেয়।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির 'বায়ুর চাপ' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :**

১.১ সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ হলো —

(ক) ১০০০ মিলিবার (খ) ১০১৩.২৫ মিলিবার (গ) ১০১.৩২৫ মিলিবার (ঘ) ২০০০ মিলিবার।

১.২ বায়ুর চাপ মাপক যন্ত্র হলো —

(ক) হাইগ্রোমিটার (খ) ব্যারোমিটার (গ) থার্মোমিটার (ঘ) অ্যানিমোমিটার।

২. **নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :**

২.১ **উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

২.১.১ উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বায়ুমণ্ডলে বায়ুচাপ _____ পায়।

২.১.২ উচ্চতা _____ পেলে বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস পায়।

২.২ **বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :**

২.২.১ কোনো বস্তুর উপর সমস্ত দিক থেকে বায়ু চাপ দেয় না।

২.২.২ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাপ বেশি হলে বায়ুর চাপ কম হয়।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ বায়ুর চাপ বলতে কী বোঝায়?

৩.২ বায়ুর উচ্চচাপ বলতে কী বোঝায়?

৩.৩ উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বায়ুর চাপ হ্রাস পায় কেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৪.১ বায়ুর উষ্ণতার সঙ্গে বায়ুর চাপের সম্পর্ক কী?

৪.২ বায়ুর চাপ কীভাবে কাজ করে তা একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে গুছিয়ে লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার দুপাশে সময় পার্থক্য হয় —

(ক) ১২ ঘণ্টা (খ) ৬ ঘণ্টা (গ) ৪৮ ঘণ্টা (ঘ) ২৪ ঘণ্টা।

১.২ রকেটে চেপে প্রথম মহাকাশে যান —

(ক) রাকেশ শর্মা (খ) ইউরি গ্যাগারিন (গ) নিল আর্মস্ট্রং (গ) এডুইন অলড্রিন।

১.৩ পৃথিবীর আবর্তন গতি সবচেয়ে বেশি —

(ক) মেরুতে (খ) কর্কটক্রান্তি রেখায় (গ) নিরক্ষরেখায় (ঘ) মকরক্রান্তি রেখায়।

১.৪ ১° অন্তর ভূ-গোলকে অঙ্কিত মোট অক্ষরেখার সংখ্যা হলো —

(ক) ১৮০টি (খ) ১৭৯টি (গ) ১৭৮টি (ঘ) ১৮১টি।

১.৫ বায়ুর চাপের একক হলো—

(ক) মিলিগ্রাম (খ) মিলিলিটার (গ) মিলিমিটার (ঘ) মিলিবার।

১.৬ বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে চাপ—

(ক) কমে (খ) বাড়ে (গ) একই থাকে (ঘ) ওঠানামা করে।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ দুটি জোয়ারের মাঝখানে জল কমে গেলে তাকে বলে _____।

২.১.২ স্থানীয় সময় মাপা যায় _____ ঘড়ির সাহায্যে।

২.১.৩ কুয়াশার মতো বিস্তৃত যে পুঞ্জ থেকে অনেক নক্ষত্রের জন্ম হয়, তার নাম _____।

২.১.৪ উচ্চতা বাড়লে উষ্ণতা ও বায়ুর _____ কমে।

২.১.৫ বায়ুপ্রবাহ সর্বদাই _____ চাপের দিকে হয়।

২.২ বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তন করলেও সূর্য পূর্বদিকেই উঠত।

২.২.২ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অবলম্বনে আঁকা হয়েছে।

২.২.৩ শুধু চাঁদের মহাকর্ষের টানে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা হয়।

২.২.৪ মূলমধ্যরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি সমান গোলার্ধে ভাগ করেছে।

২.২.৫ বায়ু সব সময় কোনো একদিক থেকে চাপ দেয়।

২.২.৬ আর্দ্রতা বেশি হলে বায়ুচাপ কম হয়।

২.৩ **'ক' স্তম্ভের সাথে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :**

'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ
২.৩.১	স্থানীয় সময় মাপন	১. অনেক নক্ষত্রের সমষ্টি
২.৩.২	আকাশগঙ্গা	২. ভোর ও গোধূলি
২.৩.৩	দিন রাতের সৃষ্টি	৩. সূর্যঘড়ি
২.৩.৪	ছায়াবৃত্ত	৪. আহ্নিক গতি

২.৪ **একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :**

২.৪.১ ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার নাম কী?

২.৪.২ সৌরপরিবারে কোন গ্রহ সবচেয়ে উত্তপ্ত?

২.৪.৩ চাঁদের ছায়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়লে সেই গ্রহণকে কী বলে?

২.৪.৪ কোন দ্রাঘিমারেখার সাপেক্ষে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ সূর্যঘড়ি কাকে বলে?

৩.২ পৃথিবীর 'অক্ষ' কাকে বলে?

৩.৩ পৃথিবীর আকৃতি অভিগত গোলকের মতো কেন বলা হয়?

৩.৪ দ্রাঘিমা কাকে বলে?

৩.৫ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ কোনো দেশে 'প্রমাণ সময়' ধারণাটির প্রয়োজন কেন হয়?

৪.২ ''পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীরই মতো'' — কথাটি ব্যাখ্যা করো।

৪.৩ ছায়াবৃত্ত কীভাবে সৃষ্টি হয়?

৪.৪ একটি চিত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ কিভাবে নির্ণয় করা যায় দেখাও।

৪.৫ বায়ুর নিম্নচাপ ও উচ্চচাপের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখো।

৫. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কীভাবে কোনো একটি দিন শুরু হওয়ার সমস্যাটি সমাধান করেছে — তা ব্যাখ্যা করো।

4 শিলা ও মাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- শিলার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।

তোমরা জানো, প্রকৃতিতে অনেক রকম মৌল রয়েছে। যেমন - অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, সিলিকন, পটাশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। এগুলিকে কোনো উপায়ে আরো সরল পদার্থে ভেঙে ফেলা যায় না। কিন্তু এগুলি মিলিত হয়ে তৈরি হয় যৌগ। যেমন — সিলিকন ও অক্সিজেন মিলিত হয়ে তৈরি হয় সিলিকা বা সিলিকন ডাইঅক্সাইড যাকে আমরা কোয়ার্টজ বলে থাকি। আবার পটাশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেন মিলিত হয়ে তৈরি হয় ফেল্ডসপার। এই কোয়ার্টজ, ফেল্ডসপার এবং এরকম আরো অনেক খনিজ মিলিত হয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন প্রকার **শিলা**।

প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে (কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও) শিলা ভেঙে, গুঁড়ো হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। মাটি থেকেই বিভিন্ন মৌল যৌগ আকারে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রবেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে শিলা বিয়োজিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় এবং মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ বিয়োজিত হলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস যুক্ত হয়। এভাবেই অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয় বা মৌলগুলি চক্রাকার প্রবাহে প্রকৃতিতে ফিরে আসে।

পৃথিবীর যে অংশে আমরা বসবাস করি তাকে বলে **ভূত্বক**। এর নীচে অনেক স্থানে আছে গলিত শিলা বা তরল ম্যাগমা। ম্যাগমার মধ্যে নানান প্রকারের খনিজ থাকে এবং যখন ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে কঠিন হয়, তখন তৈরি হয় প্রাথমিক বা আগ্নেয় শিলা (উদাহরণ — গ্রানাইট, ব্যাসল্ট)। এই শিলা ভেঙে শিলাচূর্ণের সৃষ্টি হয় ও নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটি তৈরি হয়। এই শিলাচূর্ণ ও মাটি স্তরে স্তরে জমাটবদ্ধ হয়ে তৈরি হয় পাললিক শিলা (উদাহরণ — বেলেপাথর, চুনাপাথর)। আবার ভূগর্ভের ভয়ানক তাপ ও চাপে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই সব শিলা একেবারে অন্যরকম শিলায় পরিবর্তিত হয় যাকে বলে রূপান্তরিত শিলা (উদাহরণ — মার্বেল, নিস)।

এই শিলাগুলি বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রকম মাটি তৈরি করে। সাধারণত শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে শিলা ভেঙে টুকরো টুকরো হলে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি থাকে। জলবায়ু অতিরিক্ত আর্দ্র হলে শিলার ভিতরে জল ঢুকে কাদামাটি তৈরি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এছাড়াও থাকে নানা রাসায়নিক পদার্থ ও বিভিন্ন অণুজীব, যারা মাটি তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে সব মাটি এক

ল্যাটেরাইট

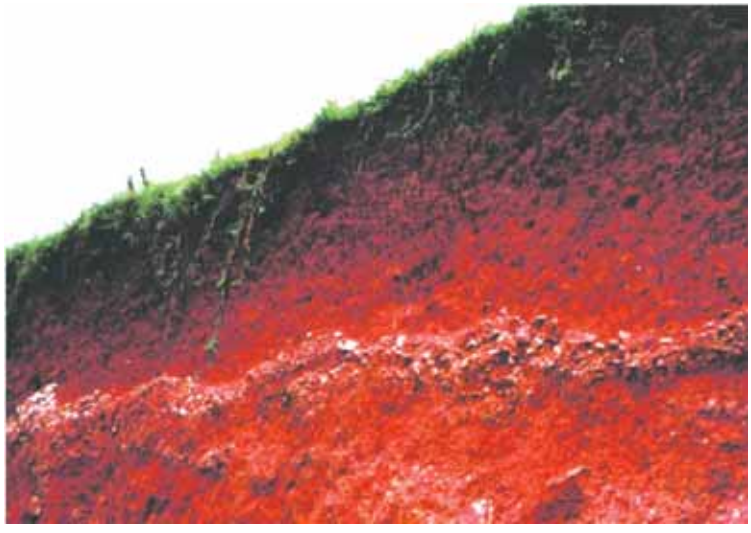

লাল মাটি

রকমের হয় না ও তাতে একই ধরনের খনিজ পদার্থও থাকে না। কোনো মাটির রঙ বাদামি, কোনোটা ধূসর, কোনোটা কালো, আবার কোনোটা লাল। কোন মাটির মধ্যে কী খনিজ রয়েছে, অনেকটা তার ওপরেই নির্ভর করে মাটির রঙ, যেমন লাল মাটিতে প্রচুর পরিমাণে লোহা থাকার কারণে এর রঙ লাল। তোমরা দেখেছো লোহায় মরচে ধরে গেলে তার রঙ লাল হয়ে যায়। একইভাবে, যে মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশি, তা জলের সংস্পর্শে এলে মরচে ধরে লাল হয়ে যায়।

সব মাটিতে আবার সব রকমের ফসল ফলানো যায় না, কারণ প্রত্যেকটি ফসলের জন্য নির্দিষ্ট পুষ্টিমৌল প্রয়োজন হয়। যেমন - নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিমৌলের সঠিক মিশ্রণ থাকলে সেই মাটি খুব উর্বর হয়। এই মাটিতে নানান রকমের ফসল উৎপাদন করা যায়। এমনই একটি মাটি হলো পলিমাটি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই নদীর বয়ে আনা পলিমাটি রয়েছে, তাই আমাদের রাজ্যে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন বেশি।

সুতরাং বলাই বাহুল্য, মাটির ওপরে আমরা অত্যন্ত নির্ভরশীল। যেখানকার মাটি যত উর্বর, সেখানে তত বেশি মানুষ বসবাস করে। যেমন - পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ। এছাড়াও মাটি আমাদের আরো অনেক কাজে লাগে, যার মধ্যে অন্যতম হলো নির্মাণ কাজ বা বাড়ি বানানো, কারণ ইট তৈরি হয় এই মাটি থেকেই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই মাটিকে সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি।

মনে রাখা জরুরি :

- **মৌল** — যেসব উপাদানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করলেও ওই উপাদান ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায়না।
- **যৌগ**— যেসব পদার্থ দুই বা তার বেশি ভিন্নধর্মী মৌল উপাদান দিয়ে গঠিত।
- **খনিজ** — প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট অজৈব মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ, যাদের নির্দিষ্ট কেলাসাকৃতি গঠন, রাসায়নিক ধর্ম ও নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি আছে।
- **পুষ্টিমৌল** — পুষ্টির উপাদান, যা জীবের সুষম বৃদ্ধি ঘটায়।

এই বিষয়ে তোমরা সপ্তম শ্রেণির 'শিলা ও মাটি' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ পাললিক শিলার একটি উদাহরণ হলো —

(ক) গ্রানাইট (খ) বেলেপাথর (গ) ব্যাসল্ট (ঘ) মার্বেল।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

২.১.১ স্তরে স্তরে পলি জমা পড়ে _____ শিলা তৈরি হয়।

২.১.২ _____ মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশি থাকে।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.১.১ গ্রানাইট একটি আগ্নেয় শিলা।

২.২.২ একই মাটিতে সবরকম ফসল উৎপাদিত হয়।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ নিস	১. খনিজ পদার্থ
২.৩.২ কোয়ার্টজ	২. মৌলিক পদার্থ
২.৩.৩ অক্সিজেন	৩. পাললিক শিলা
২.৩.৪ চুনাপাথর	৪. রূপান্তরিত শিলা

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ লোহাতে মরচে ধরলে তার রঙ কী হয়?

২.৪.২ কোন মাটি বেশি থাকার কারণে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অত্যন্ত উন্নত?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ খনিজ পদার্থ কাকে বলে?

৩.২ শিলা বলতে কী বোঝায়?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ শুষ্ক ও আর্দ্র পরিবেশে কী প্রকার মাটি তৈরি হয় ও কেন?

৪.২ কোন প্রকার মাটিকে উর্বর মাটি বলা হয়?

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ শিলা কয় প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লেখো।

৫.২ মাটির গুরুত্ব উল্লেখ করো।

5 নদীর প্রাথমিক ধারণা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর:

- বিভিন্ন প্রকার নদীর শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতে পারবে।
- নদীর উচ্চ, মধ্য ও নিম্নগতির মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
- মানুষের জীবনে নদীর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

পুকুর-জলাশয়, খাল-বিল, নালা-নর্দমা, হ্রদ-উপহ্রদ, সাগর-মহাসাগর সবেতেই জল আছে। কিন্তু সবকটিকেই নদী বলা যাবে কি? 'না'—একে নদী বলব না।

আসলে নদী হলো স্বাভাবিক প্রবহমান জলধারা, যা অভিকর্ষের টানে ভূমির ঢাল অনুসরণ করে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক খাতের মধ্যে দিয়ে উৎস থেকে মোহনার দিকে প্রবাহিত হয়।

এসো আমরা নদী সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জেনে নিই —

- কোনো ভূভাগের প্রাথমিক ঢাল অনুসারে সবচেয়ে গভীর খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মূল জলধারাকে **প্রধান নদী** বলে। যেমন—গঙ্গা নদী, সিন্ধু নদী।
- ভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট কোনো নদী যখন তার জলধারা বয়ে নিয়ে এসে মূলনদীতে পড়ে তখন তাকে **উপনদী** বলে। যেমন—যমুনা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী এগুলো গঙ্গার উপনদী।
- মূল নদী থেকে উৎপন্ন ছোটো জলধারাগুলি অন্যত্র পতিত হলে, তাকে **শাখানদী** বলে। যেমন—গঙ্গার প্রধান শাখা-নদী হলো ভাগীরথী-হুগলি।
- বরফগলা জলে পুষ্ট নদীগুলিতে সারাবছর জল থাকে বলে, এদের **নিত্যবহ নদী** বলে। যেমন—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী (এদের সাধারণত মানচিত্রে নীলরঙে দেখানো হয়)।
- অপেক্ষাকৃত কম উঁচু পাহাড় ও মালভূমি থেকে সৃষ্ট বৃষ্টির জলে পুষ্ট যেসব নদীতে সারাবছর জল থাকে না কিংবা গ্রীষ্মকালে জলের প্রবাহ খুব কমে যায়, তাদের **অনিত্যবহ নদী** বলে। যেমন— পশ্চিমবঙ্গের অজয়, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি।
- সমুদ্র উপকূলবর্তী যেসব নদী জোয়ারের জলে পূর্ণ হয় ও ভাটার সময় ঐসব নদীতে জল কমে যায় তাদের **জোয়ারের জলে পুষ্ট নদী** বলে। যেমন—পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলের মাতলা, গোসাবা, রায়মঙ্গল প্রভৃতি।
- যেসব নদী কোনো উন্মুক্ত সাগরের সঙ্গে মিলিত না হয়ে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মিলিত হয়েছে বা দেশের অভ্যন্তরেই হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে তাকে **অন্তর্বাহিনী** নদী বলে। যেমন— ভারতের লুনি, ঘাগর, রাশিয়ার আমুদরিয়া, সিরদরিয়া প্রভৃতি হল **অন্তর্বাহিনী** নদী।
- যেসব নদী একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাদের **আন্তর্জাতিক** নদী বলে। যেমন— এশিয়ার গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ইউরোপের রাইন, দানিয়ুব হলো **আন্তর্জাতিক** নদী।
- 'উৎস' থেকে 'মোহনা' পর্যন্ত নদী যে খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে **নদীর উপত্যকা** (River Valley) বলে।

আমরা নদীকে খুব করিৎকর্মা বলতে পারি। কারণ সে তার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নানা ধরনের ছোটো-বড়ো ভূমিরূপ তৈরি করেই চলে।

এসো আমরা নদীর গতি ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করি—

নদী যেখানে উৎপন্ন হয় সেই উৎস অঞ্চলের ভূমির ঢাল ও সমুদ্র থেকে উচ্চতা বেশি হয়। ক্রমাগত যতই মোহনার দিকে এগোনো যায় নদী উপত্যকার ভূমিঢাল ও সমুদ্র থেকে উচ্চতা ততই কমতে থাকে। তাইতো উৎস অঞ্চলে বা পার্বত্য প্রবাহে নদী অত্যন্ত শক্তিশালী ও তীব্র গতিবেগসম্পন্ন হয়ে থাকে।

জেনে রাখো

সমুদ্র সমতল হলো নদীর নিম্নক্ষয়ের শেষ সীমা।

- উৎস থেকে সমভূমিতে নামার আগে পর্যন্ত নদীর **উচ্চপ্রবাহে** নদীর প্রধান কাজ হলো ক্ষয়। গঠিত প্রধান ভূমিরূপগুলি হলো— গিরিখাত, জলপ্রপাত প্রভৃতি।
- পার্বত্যপ্রবাহ বা উচ্চগতির পর মালভূমি বা সমভূমি অঞ্চলে নদীর **মধ্যপ্রবাহ** দেখা যায়। মধ্যপ্রবাহে নদী মূলত বহন ও সঞ্চয় কাজ করে। মধ্যপ্রবাহে ভূমিঢাল হ্রাস পায় কিন্তু জলের পরিমাণ বাড়ার ফলে মিয়েন্ডার (আঁকাবাঁকা নদীপথ) ও পলি সঞ্চিত নদীদ্বীপ গঠিত হয়।
- উচ্চপ্রবাহ ও মধ্যপ্রবাহের পর মৃদু ভূমিঢালের ওপর দিয়ে ধীর গতিসম্পন্ন স্বল্প শক্তির আঁকাবাঁকা নদীরূপে মোহনায় গিয়ে পতিত হয়, একে **নিম্নপ্রবাহ** বলে। নিম্নপ্রবাহে নদীর মূল কাজ হলো সঞ্চয়। নিম্নপ্রবাহে নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত প্রধান ভূমিরূপগুলি হল— চড়া, প্লাবনভূমি, বদ্বীপ প্রভৃতি।

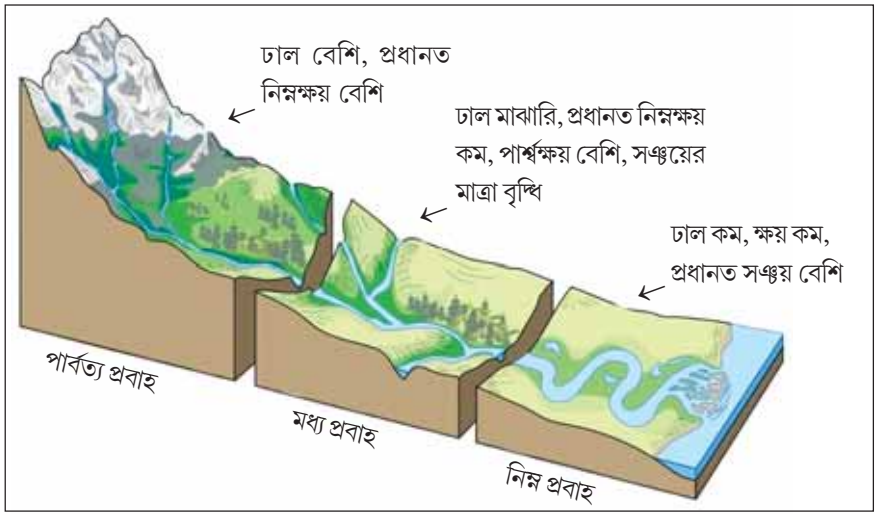

বিভিন্ন প্রবাহে নদীর কাজ

জেনে রেখো

- যে-সকল নদীতে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন প্রবাহ দেখা যায় তাদের **আদর্শ নদী** বলে, যেমন— গঙ্গা নদী। সব নদী আদর্শ নদী হয় না, কারণ সব নদীতে নদীর তিনটি প্রবাহ সুস্পষ্ট হয় না।
- পৃথিবীর প্রায় ৬০ শতাংশ ভূমিরূপ নদীর কাজের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।
- নদী অববাহিকা জলচক্রের একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ।
- একই নদী অববাহিকার পাশাপাশি প্রবাহিত দুটো নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে **দোয়াব** বলে।
- দুটি নদীর মাঝের উঁচু ভূভাগ হলো **জলবিভাজিকা**।

তোমরা জানো প্রাচীনকাল থেকে মানুষের সঙ্গে নদীর এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি (সিন্ধু সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা) ছিল প্রধানত নদীকেন্দ্রিক। বন্যাপ্রবণ নদী অববাহিকাও জনবহুল বসতিতে পরিণত হয়। এখন এসো আমরা জেনে নিই আমাদের জীবনে নদীর গুরুত্ব —

একনজরে জনজীবনে নদীর প্রভাব

- **পানীয় জলের উৎসরূপে** — প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে নদীর জল।
- **কৃষিকাজ**— নদী তীরের পলি সমৃদ্ধ উর্বর মৃত্তিকায় কৃষিকাজ ভালো হয়।
- **জলসেচ**— নদী তীরবর্তী কৃষিজমিতে জলসেচের সুযোগ থাকে।
- **শিল্প স্থাপন**— জলের জোগান সুনিশ্চিত করে (যেমন - হুগলি শিল্পাঞ্চল) নদীর জল।
- **আবাসস্থল**— জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসস্থান হিসেবে নদী গুরুত্বপূর্ণ।
- **জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ**— নদীতীরবর্তী সমভাবাপন্ন জলবায়ু আরামদায়ক।
- **জলচক্র**— নদী জলচক্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- **বাণিজ্য ও পরিবহণ**— অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়।
- **জলবিদ্যুৎ উৎপাদন**— নদীতে বাঁধ দিয়ে তার জলকে বহুমুখী কাজ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- **প্রাকৃতিক সীমানা**— নদী দুটি রাজ্য, দেশ বা গ্রাম-শহরকে আলাদা করে।
- **প্রতিরক্ষায়**— বহিঃশত্রুর হঠাৎ আক্রমণ থেকে রক্ষা করে গভীর নদী।
- **নতুন ভূভাগ** — নদী নতুন ভূভাগের সৃষ্টি করে। যেমন – বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নয়াচর, ঘোড়ামারা প্রভৃতি।
- **নদীর পাড় ভাঙ্গন**— কৃষিজমি ও বসতবাটী গ্রাস করে (যেমন - মুর্শিদাবাদে গঙ্গার পাড় ভাঙ্গন)
- **বন্যার প্রকোপ**— কৃষিজমি, বসতিসহ প্রাণ ও সম্পত্তির হানি ঘটায়। সাম্প্রতিককালে কেলেঘাই নদীর জল ঢুকে পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে।
- **বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য**— পরিবেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **জীবিকার উৎস** — মৎস আহরণ মানুষের জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করে।
- **ভ্রমণ ও বিনোদন**— নদীকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন ও নৌপর্যটন মানুষকে বিনোদন প্রদান করে।

মনে রাখা জরুরি :

- **নদী অববাহিকা —** নদীর উৎস অঞ্চলের জলধারাগুলি যতদূর এলাকা থেকে জল বয়ে নিয়ে আসে বা মূল নদী থেকে যতদূর জল ছড়িয়ে পড়ে সেই পুরো এলাকাটিকেই নদী অববাহিকা বলে।
- **জলচক্র —** নদী-সাগরের জল সূর্যতাপে বাষ্পীভূত হয়ে উপরে ওঠে, শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। তারপর বৃষ্টিরূপে নদী-সাগরে ফিরে আসে, জলের এই চক্রাকার আবর্তনই হলো জলচক্র।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির 'নদী' অধ্যায়ে নদী সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের তথ্য, যেমন — নদীর কাজ, ভূমিরূপ প্রভৃতি 'নদী' নামক অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত ভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্প প্রশ্নগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ নদীর নিম্নপ্রবাহে সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয়—

(ক) মন্থকূপ (খ) গিরিখাত (গ) বদ্বীপ (ঘ) জলপ্রপাত।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ নদীর উৎপত্তি স্থলকে নদীর _____ বলে।

২.১.২ যে নদীতে সারা বছর জল থাকে না তাকে বলে _____ নদী।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ ভারতের লুনি হলো একটি অন্তর্বাহিনী নদী।

২.২.২ আঁকাবাঁকা নদীর গতিপথকে মিয়েন্ডার বলে।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ উচ্চপ্রবাহ	১. প্লাবনভূমি
২.৩.২ মধ্যপ্রবাহ	২. জলপ্রপাত
২.৩.৩. নিম্নপ্রবাহ	৩. মিয়েন্ডার

২.৪. একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ উপনদী কাকে বলে?

২.৪.২ দোয়াব কী?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ নদী উপত্যকা কাকে বলে?

৩.২ জলবিভাজিকা বলতে কী বোঝো?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ নদীর উচ্চপ্রবাহ ও নিম্নপ্রবাহের মধ্যে তিনটি তুলনা করো।

৪.২ আদর্শ নদীর তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৫. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৫.১ ''জনজীবনে নদ-নদীর প্রভাব অপরিসীম''— বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

6 জলদূষণ ও মাটিদূষণের সাধারণ ধারণা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- জলদূষণ ও মাটিদূষণের কারণগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।
- জলদূষণ ও মাটিদূষণ কীভাবে ঘটে তা বর্ণনা করতে পারবে।
- জলদূষণ ও মাটিদূষণ মানুষের জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করে তা বর্ণনা করতে পারবে।
- জলদূষণ ও মাটিদূষণ প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করতে পারবে।

জলের অপর নাম জীবন। প্রতিটি জীবেরই বেঁচে থাকার জন্য জলের প্রয়োজন। পৃথিবীতে মোট যা জল সঞ্চিত আছে তার মাত্র ২.৭% জল হলো মিষ্টি জল।

জলদূষণ

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের জলের চাহিদাও বাড়ছে। গৃহস্থালীর কাজে, কৃষিতে, শিল্পে জল যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে শুধু যে জলের অভাব দেখা দিচ্ছে তা নয়, জলের মধ্যে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত পদার্থ বা দূষক মিশছে এবং জলের গুণমানের অবনমন ঘটিয়ে জলকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তুলছে। এই সমস্ত দূষক জলে মেশার ফলে জলের প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈব উপাদানগুলির গুণমান নষ্ট হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে **জলদূষণ**।

জল দূষক

জৈব পদার্থ	**অজৈব পদার্থ**	**জীবাণু**
(ক) মানুষ ও প্রাণীর বর্জ্য	(ক) পারদ	(ক) ব্যাকটেরিয়া
(খ) খনিজ তেল	(খ) সীসা	(খ) ভাইরাস
(গ) জীবের মৃতদেহ	(গ) তামা	(গ) পরজীবি
	(ঘ) আর্সেনিক	

জল দূষক

জলদূষণের উৎস

প্রত্যক্ষ উৎস	অপ্রত্যক্ষ উৎস
(ক) কলকারখানা	(ক) পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জল
(খ) আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র	(খ) কৃষিজমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক
(গ) কাগজ কল	

জলদূষণের উৎস

জলদূষণ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুভাবেই হতে পারে, কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন উৎস থেকে বেশি পরিমাণে জল দূষিত হয়।

জলদূষণের প্রভাব

- জলদূষণের ফলে নদী, হ্রদ, পুকুর প্রভৃতির জলে পরিপোষকের পরিমাণ বেড়ে যায়।
- বিভিন্ন জৈব দূষক জলে মিশলে জলে বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া বাড়ে, ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়।
- জলে বিভিন্ন জীবাণু মিশলে জল দূষিত হয় এবং বিভিন্ন জলবাহিত রোগের সৃষ্টি হয়। যেমন — হেপাটাইটিস, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি।

বেঙ্গালুরুর বেলান্দুর হ্রদে সৃষ্ট বিষাক্ত ফেনা

✸ **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে জলদূষণ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করো এবং জলদূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তোমাদের মতামত দাও। দলগতভাবে কাজটি করার সময় প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও।**

- তোমাদের এলাকার পানীয় জলের উৎস কী কী?
- দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত জল বা কৃষিকাজে ব্যবহৃত জল কোথা থেকে আসে?
- পানীয় জল বা নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত পুকুর, নদীর জলে কখনো নোংরা, দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কি?
- জল দূষিত হলে তার সম্ভাব্য কারণগুলি কী কী বলে তোমাদের মনে হয়?
- দূষণের ফলে তোমাদের এলাকায় সম্ভাব্য কোন কোন রোগ হতে পারে?
- জলদূষণ রোধে তোমরা কী কী উপায় অবলম্বন করবে?

মাটিদূষণ

ভূপৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত খনিজ ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ শিথিল স্তর হল মাটি, যা উদ্ভিদকে ধারণ করে। মাটি একটি গুরত্বপূর্ণ সম্পদ, কারণ মাটিতেই ফসল উৎপন্ন হয় এবং এই ফসল মানুষের খাদ্য ও জীবিকার অন্যতম মাধ্যম।

কিন্তু প্রধানত মানুষ দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন দূষক উপাদান মাটিতে মেশার ফলে মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং মাটির গুণমান নষ্ট হচ্ছে। মাটির এই গুণমান নষ্ট হয়ে যাওয়াই হল মাটিদূষণ।

মাটিদূষণ

মাটি দূষক

জৈব দূষক

(ক) মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বর্জ্য

(খ) জীবের মৃতদেহ

অজৈব দূষক

(ক) কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক

(খ) কলকারখানা থেকে নিঃসৃত তরল বর্জ্য

(গ) আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থেকে সৃষ্ট বর্জ্য

কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক

মাটিদূষণের উৎস

- জৈব পদার্থ ঘটিত দূষণ (জীবের মৃতদেহ)
- অজৈব পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট দূষণ (সিসা, ক্যাডমিয়াম)
- তেজস্ক্রিয় দূষণ (পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র)
- প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ (আবর্জনা হিসাবে নিক্ষেপ)

মাটিদূষণের উৎস

মাটি দূষণের প্রভাব

- বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগ, যেমন — আমাশয়, কলেরা ইত্যাদি।
- মাটিতে পারদ ও সিসা মিশে থাকলে সেই মাটিতে উৎপন্ন খাদ্য ফসল গ্রহণের দ্বারা মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি ও বিপাকীয় ক্রিয়াতে বাধা সৃষ্টি করে।

মাটি দূষণের প্রভাব

✸ **দলগতভাবে আলোচনা করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে তোমাদের এলাকার মাটিদূষণ সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করো।**

- তোমাদের বাড়ির বর্জ্য পদার্থ বা আবর্জনা কোথায় ফেলা হয়?
- বর্জ্য পদার্থ ফেলার ফলে তোমার এলাকা কী কোনোভাবে দূষিত হচ্ছে?
- মাটিদূষণের আর কী কী কারণ থাকতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়?
- মাটিদূষণের ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়?
- মাটিদূষণ প্রতিরোধে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

মনে রাখা জরুরি :

- **দূষক** — যে সমস্ত উপাদানগুলি দূষণ সৃষ্টি করে। যেমন — গৃহস্থালীর আবর্জনা।
- **তেজস্ক্রিয় দূষণ** — বিভিন্ন পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় আবর্জনা।
- **পরিপোষক** — খাদ্যের যেসব জৈব ও অজৈব উপাদান উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণ ও পুষ্টিতে সাহায্য করে।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির 'জলদূষণ' ও 'মাটিদূষণ' অধ্যায় দুটিতে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ পৃথিবীতে সঞ্চিত জলের মধ্যে মিষ্টি জলের পরিমাণ—

(ক) ২.৩% (খ) ২.৪% (গ) ২.৬% (ঘ) ২.৭%।

১.২. একটি অজৈব দূষক হলো—

(ক) জীবের মৃতদেহ (খ) সিসা (গ) ভাইরাস (ঘ) ব্যাকটিরিয়া।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ জলদূষণের একটি প্রত্যক্ষ উৎস হলো _____।

২.১.২ মাটিদূষণের ফলে মাটির _____ নষ্ট হয়ে যায়।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ জল দূষণের ফলে মানুষের টাইফয়েড রোগ হয়।

২.২.২ চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য মাটি দূষণ সৃষ্টি করে না।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ মাটিদূষণের ফলে সৃষ্ট ব্যাকটিরিয়াঘটিত একটি রোগের নাম লেখো।

২.৩.২ তেজস্ক্রিয় দূষণের মূল উৎস কোনটি?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ জলদূষণের দুটি প্রভাব লেখো।

৩.২ মাটিদূষণ কীভাবে সৃষ্টি হয় তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ একটি চার্টের সাহায্যে উদাহরণসহ মাটি দূষণের উৎসগুলি চিহ্নিত করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. **বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :**

1.1 ~„þ îy ~„þy!•„þ ö›ï!œ„þ þ™”yí ë=þ £öë ÷“þ!î £ëôôô

S„þV ö›ïœ S…V ›y!Ýþ S†V !Ÿœy S‡V …!˜ ‹Ð

1.2 xyö@ë !Ÿœyî ~„þ!Ýþ vþ”y£î ’ £öœy ôôô

S„þV öîöœþ™yíî S…V ‰þ˜y™yíî S†V îÄy¢ÎÝþ S‡V ›yöîœÐ

১.৩ নীচে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রধান নদীতে দেখা যায় না তা হলো —

(ক) ভূমির প্রাথমিক ঢাল অনুসারে প্রবাহিত হওয়া।

(খ) অববাহিকার সবচেয়ে গভীর খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া।

(গ) মূল নদী থেকে ছোটো ছোটো জলধারার সৃষ্টি হওয়া।

(ঘ) স্থলদ্বারাবেষ্টিত জলভাগ।

১.৪ পরস্পর সম্পর্ক না থাকা জোড়টিকে আলাদা করে লেখো —

(ক) নদীর উচ্চপ্রবাহ— প্রধানত ক্ষয় কাজ

(খ) নদীর মধ্যপ্রবাহ - প্রধানত বহন ও সঞ্চয়কাজ

(গ) নদীর নিম্নপ্রবাহ — প্রধানত ক্ষয় ও বহনকাজ

(ঘ) নদীর নিম্নপ্রবাহ — প্রধানত সঞ্চয়কাজ

১.৫ নীচের কোনটি নদীর জলপ্রবাহে সরাসরি প্রভাব ফেলতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা—

(ক) ভূমির ঢাল (খ) নদীতে জলের পরিমাণ (গ) গতিবেগ (ঘ) নদীর জলের রঙ।

১.৬ পৃথিবীর স্থলভাগের অর্ধেকেরও বেশি ভূমিরূপ তৈরীর জন্য দায়ী হলো—

(ক) হিমবাহ (খ) নদী (গ) বায়ু (ঘ) সমুদ্র।

১.৭ নদী তার উচ্চগতি থেকে নিম্নগতি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে যে ভূমিরূপগুলি গঠন করে, তা হলো—

(ক) বদ্বীপ-নদীচর-মিয়েন্ডার-গিরিখাত

(খ) গিরিখাত-বদ্বীপ-মিয়েন্ডার-নদীচর

(গ) গিরিখাত - মিয়েন্ডার - নদীচর - বদ্বীপ

(ঘ) গিরিখাত - নদীচর - বদ্বীপ - মিয়েন্ডার।

২. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ **উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

2.1.1 ____________Ÿ#“þœ ç ‹›yÝþîå• £öë xyö@ë !Ÿœy ÷“þ!î £ëÐ

2.1.2 „þyöœy ›y!Ýþ ÷“þ!î £ë ____________ !Ÿœy öíö„þÐ

২.১.৩ যে নদী তার বয়ে আনা জল মূল নদীকে উপহার দেয় তাকে ____________ বলে।

২.১.৪ নদীর উৎস থেকে মোহনার দিকে যতই এগোনো যায় সমুদ্র সমতল থেকে ভূমির ______________ ততই কমতে থাকে।

২.১.৫ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, রাইন, দানিয়ুব— এরা হলো একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ______________ নদী।

২.২ বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

2.2.1 ‰þ~yþ™y í î ~„þ!Ýþ þ™yœ!œ„þ !ŸœyÐ

2.2.2 ‰þyöþ™ ç “þyöþ™ Ÿ•›ye xyö@Àë !Ÿœy îþ™yšþ!î “þ £ëÐ

২.২.৩ জলচক্র বজায় রাখতে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম।

২.২.৪ দুটো নদী যেখানে এসে মিলিত হয় তাকে দোয়াব বলে।

২.২.৫ কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবে নদীর জল উৎস থেকে মোহনার দিকে গড়িয়ে চলে।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ সিন্ধু, গঙ্গাতে	১. প্রবাহপথ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ
২.৩.২ অজয়, গন্ধেশ্বরীতে	২. সারাবছর জল থাকেনা
২.৩.৩ লুনি, ঘাগরের	৩. সারাবছর জল থাকে

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

2.4.1 öÙÝþ ö„þy~ ²Ì„þyî !ŸœyÚ

2.4.2 ~„þ!Ýþ ›y!Ýþî vþ”y£î ’ ”yç ëyö“þ …î ¦þyöœy šþ¢œ vþêþ™y”~ £ëÐ

২.৪.৩ ভূমির ঢাল নদীর কোন প্রবাহে বেশি দেখা যায়?

২.৪.৪ চড়া, প্লাবন ভূমি, বদ্বীপ নদীর কোন অংশে দেখা যায়?

২.৪.৫ মুর্শিদাবাদে গঙ্গার তীরে পশ্চিমবঙ্গের বহু কৃষিজমি ও বসত জমি গ্রাস করার মূল কারণ কী?

২.৪.৬ জোয়ার ভাটার জলে পুষ্ট নদী কোথায় দেখা যায়?

৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

3.1 !Ÿœy „þyö„þ îöœÚ

৩.২ অন্তর্বাহিনী নদী কাকে বলে?

৩.৩ অনিত্যবহ নদীগুলি সাধারণত কোথা থেকে উৎপন্ন হয়?

৩.৪ তোমার কি মনে হয় জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে নদীর কোনো ভূমিকা আছে? যদি থাকে তা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা লেখো।

৩.৫ এমন দুটি ভূমিরূপের নাম লেখো যা নদীর মধ্য ও নিম্ন উভয় প্রবাহপথেই গড়ে উঠতে পারে।

৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ নদী অববাহিকা ও জল বিভাজিকার মধ্যে সম্পর্ক লেখো।

৪.২ নিত্যবহ নদী ও অনিত্যবহ নদীর মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

৪.৩ 'নদীও খুব করিৎকর্মা' — কথাটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীপথের চরিত্রগত পরিবর্তন সম্পর্কে চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা কর।

৫.২ বিভিন্ন প্রকার নদীর শ্রেণিবিভাগ করে তাদের সম্পর্কে যা জানো লেখো।

7 এশিয়া মহাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- সভ্যতার জন্মক্ষেত্র প্রাচীন সংস্কৃতির বাহক রূপে এশিয়া মহাদেশকে 'চরম বৈচিত্র্যের মহাদেশ' রূপে বর্ণনা করতে পারবে।
- এশিয়া মহাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- এশিয়া মহাদেশের নদীর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে।
- এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবে।

তোমরা নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গের যে জেলায় বাস করো, নিশ্চয়ই সেই জেলার নাম, সদর-শহরসহ অন্যান্য শহর ও বিশেষ স্থানের বৈশিষ্ট্যগুলি আগে থেকেই জানো। যেমন — নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল ও সরপুরিয়া বিখ্যাত।

আবার তোমরা জানো ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, পৃথিবীর এই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের উজ্জ্বল অতীত, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ভাষা ধর্ম, বর্ণ, পরিধানকে কীভাবে বহন করে চলেছে। অবারিত ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, আর সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতকে 'উপমহাদেশে' পরিণত করেছে।

সুবিশাল পৃথিবীর প্রায় তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। এই স্থলভাগে রয়েছে সাতটি মহাদেশ — এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশিয়ানিয়া ও আন্টার্কটিকা।

এসো আমরা জেনে নিই আমাদের নিজেদের মহাদেশ এশিয়া সম্পর্কে —

➢ পৃথিবীর প্রায় ৬০% মানুষ এই এশিয়া মহাদেশে বাস করে।

➢ পৃথিবীর স্থলভাগের সর্বোচ্চ অংশ মাউন্ট এভারেস্ট, পৃথিবীর ছাদ পামীর মালভূমি, বৃহত্তম হ্রদ **কাস্পিয়ান**, বিশালাকার বনভূমি **তৈগা**, বৃহত্তম বদ্বীপ সমভূমি - গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, লবণাক্ত-হ্রদ **মরু সাগর** যা স্থলভাগের অন্যতম নীচু এলাকা, সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি, বিশালাকার মালভূমি, বিস্তীর্ণ সমভূমি আর উর্বর নদীউপত্যকাযুক্ত এশিয়া মহাদেশ চরম বৈচিত্র্যের সমাগম ঘটাতে পেরেছে। তাই এই মহাদেশকে **চরম বৈচিত্র্যের মহাদেশ** বলা হয়।

➢ সভ্যতার জন্মক্ষেত্র রূপে নদীমাতৃক সভ্যতাগুলি — সিন্ধু, সুমেরীয় ও চৈনিক সভ্যতার বিকাশ আজও প্রাচ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে সুবিদিত।

➢ নানা-জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, শিল্প-সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, জনগোষ্ঠী, উৎসব অনুষ্ঠানের অন্যান্য বৈচিত্র্য এশিয়া মহাদেশের ঐতিহ্যবাহক।

অবস্থান ও সীমা

এশিয়া মহাদেশ উত্তরে ৭৭°৪৩′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ১°১৬′ দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং পশ্চিমে ২৬°০৪′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে পূর্বে ১৬৯°৪০′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এশিয়া মহাদেশ পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর, উত্তরে সুমেরু মহাসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত।

এশিয়ার উল্লেখযোগ্য দেশগুলি হলো চিন, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, জাপান, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, ইজরায়েল প্রভৃতি।

এশিয়া : রাজনৈতিক

এশিয়া
রাজনৈতিক
দেশের রাজধানী
0 1000 2000
কিলোমিটার
রাশিয়া
চিন
মঙ্গোলিয়া
কাজাখস্তান
ভারত
ইরান
পাকিস্তান
আফগানিস্তান
সৌদি আরব
তুরস্ক
ইউরোপ
আফ্রিকা
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
দঃ চীন সাগর
ভূমধ্যসাগর

এশিয়ার ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময়, এটি মূলত ৬টি ভাগে বিভক্ত —

এশিয়ার ভূপ্রকৃতি

- দক্ষিণের প্রাচীন মালভূমি
  - আরবের মালভূমি
  - দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
  - ইন্দোচিন মালভূমি
- উত্তরের বিশাল সমতলভূমি
  - তুরানের নিম্নভূমি
  - সাইবেরিয়ার সমভূমি (পশ্চিমে)
  - পূর্বের উচ্চভূমি বা সাইবেরিয়ান শিল্ড
- মধ্যভাগের পার্বত্যভূমি (পর্বতমালা নির্গত)
  - পামীরগ্রন্থি থেকে
  - আর্মেনীয় গ্রন্থি থেকে
  - উচ্চমালভূমি (তিব্বত, পামীর, ইরান ও ইউনান)
- দক্ষিণ ও পূর্বের নদীগঠিত সমভূমি
  - উত্তর চীন সমভূমি
  - সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি
  - মেসোপটেমিয়া সমভূমি
- উপকূলের সমভূমি
- দ্বীপপুঞ্জ
  - জাপানের দ্বীপপুঞ্জ
  - ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ
  - কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ
  - ফিলিপাইনস দ্বীপপুঞ্জ

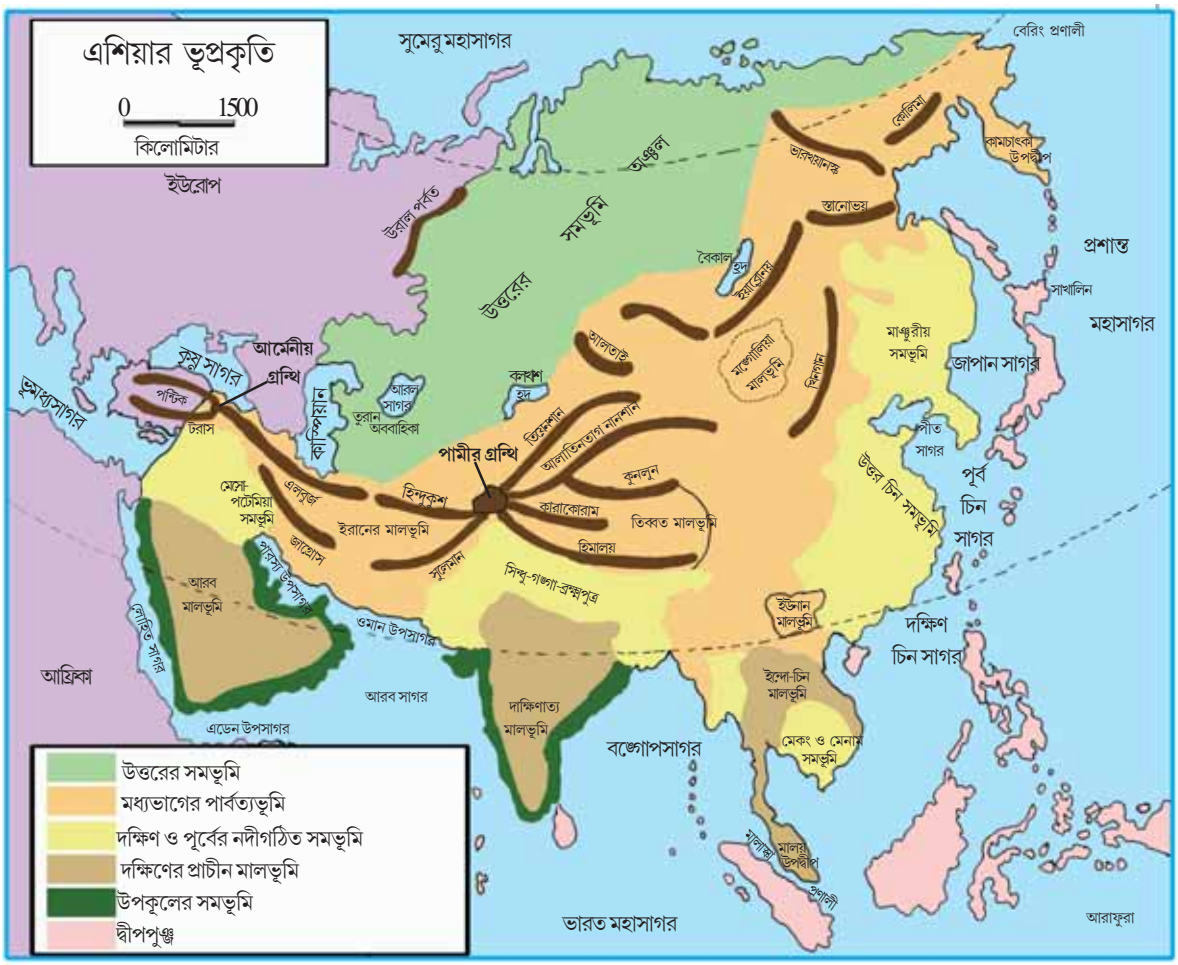

জেনে রাখো

পর্বতগ্রন্থি — যেখান থেকে পর্বতমালাগুলি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়।

শিল্ড অঞ্চল — শক্ত শিলা দ্বারা গঠিত প্রাচীন মালভূমি অঞ্চল।

এশিয়ার নদনদী

এশিয়া মহাদেশের ভূমিঢাল, নদীপ্রবাহ থেকে বোঝা যায়। কারণ তোমরা জানো, নদী ভূমির ঢালকে অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়। এশিয়ার মধ্যভাগের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে ভূমিঢাল ত্রিমুখী অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে প্রসারিত হতে দেখা যায়। নদী হলো কোনো দেশ বা মহাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, ভূপ্রকৃতি ও অর্থনীতির বাহক, অনেকক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকও বটে।

এশিয়া মহাদেশের নদীগুলিকে প্রবাহের দিক অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) উত্তর বাহিনী নদী (২) দক্ষিণ বাহিনী নদী (৩) পূর্ব বাহিনী নদী (৪) পশ্চিম বাহিনী নদী।

উত্তরবাহিনী নদীর বৈশিষ্ট্য

ওব — আলতাই পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ওব উপসাগরে হয়েছে।

ইয়েনিসি — সায়ান পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ইয়েনিসি উপসাগরে মিলিত হয়েছে।

লেনা — বৈকাল পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে লাপ্টেভিক সাগরে পতিত হয়েছে।

- উপরোক্ত নদীর মোহনাগুলি হিমমণ্ডলের উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত। তাই বছরের ৮ থেকে ৯ মাস বরফাবৃত থাকে। উৎস অঞ্চলে শরৎ ও বসন্তের বৃষ্টি প্রায়শই বন্যা ঘটায়।
- নদীগুলি নৌপরিবহনের জন্য উপযুক্ত নয়।
- নদী উপত্যকাগুলি জনবিরল।
- নদী অববাহিকায় একাধিক জলাভূমি দেখা যায়।

দক্ষিণদিকে প্রবাহিত নদীর বৈশিষ্ট্য

দক্ষিণবাহিনী প্রধান নদীগুলি হলো — গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুনদী, মেকং, মেনাম, ইরাবতী, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস বাদে এশিয়ার দক্ষিণাংশের বেশিরভাগ নদনদী মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। তাই বৃষ্টির জলে পুষ্ট।

- পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সারাবছর বরফগলা জলে পুষ্ট।
- ঘনবসতিপূর্ণ নদী অববাহিকাগুলির অধিকাংশই বন্যাপ্রবণ।
- নদীগুলি নৌপরিবহন, কৃষিকাজ ও জলসেচের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

এশিয়ার নদ নদী

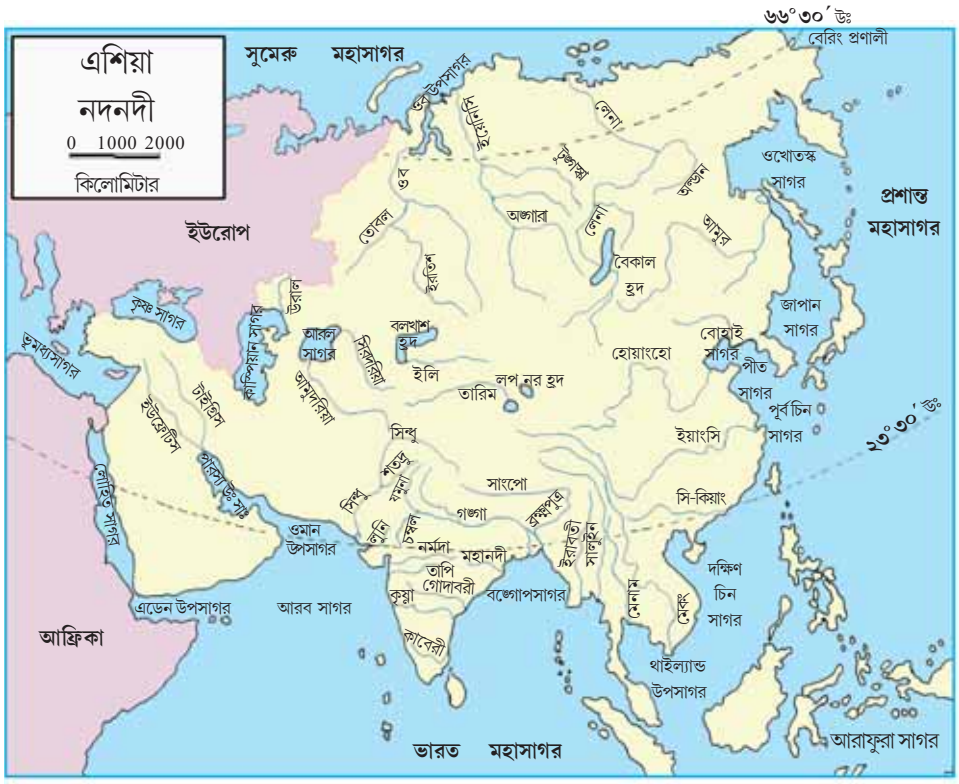

পূর্ববাহিনী নদীর বৈশিষ্ট্য

পূর্ববাহিনী নদীগুলির মধ্যে ইয়াংসি এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম, একে স্বর্ণরেণুর নদী বলে। সিকিয়াং, হোয়াং-হো বা পীত নদী, চীনের দুঃখ নামে পরিচিত। এছাড়া আমুর নদীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

- নদীগুলি এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন চিন সাগর, ওখটস্ক সাগরে পতিত হয়েছে।
- নদী উপকূলীয় উর্বর পলি সমৃদ্ধ সমভূমি কৃষি ও শিল্পে খুবই উন্নত ও ঘনবসতিপূর্ণ।

পশ্চিমবাহিনী নদীর বৈশিষ্ট্য

- সিরদরিয়া, আমুদরিয়া, লুনি, ঘাঘর কেবলমাত্র বর্ষার জলে পুষ্ট অন্তর্বাহিনী নদী।
- স্বল্প দৈর্ঘ্যের ক্ষীণকায় নদীগুলি দেশের অভ্যন্তরেই কোনো জলভাগের সাথে মিলিত হয়েছে।
- ভারতের সাতপুরা পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন নর্মদা ও তাপি নদী পশ্চিমবাহিনী হয়ে আরব সাগরে পতিত হয়েছে।
- ভারতের এই নদীগুলি গ্রস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এদের মোহনায় বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি।
- বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদীগুলি বর্ষাকালে খরস্রোতা হয়।

✷ **নীচের প্রদত্ত ছকে সংখ্যাগুলি যে যে পর্বতগ্রন্থি, পর্বতমালা, মালভূমি, নদী ও সংশ্লিষ্ট নদীর মোহনাকে নির্দেশ করছে সেগুলির নাম লেখো। দলগতভাবে আলোচনা করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।**

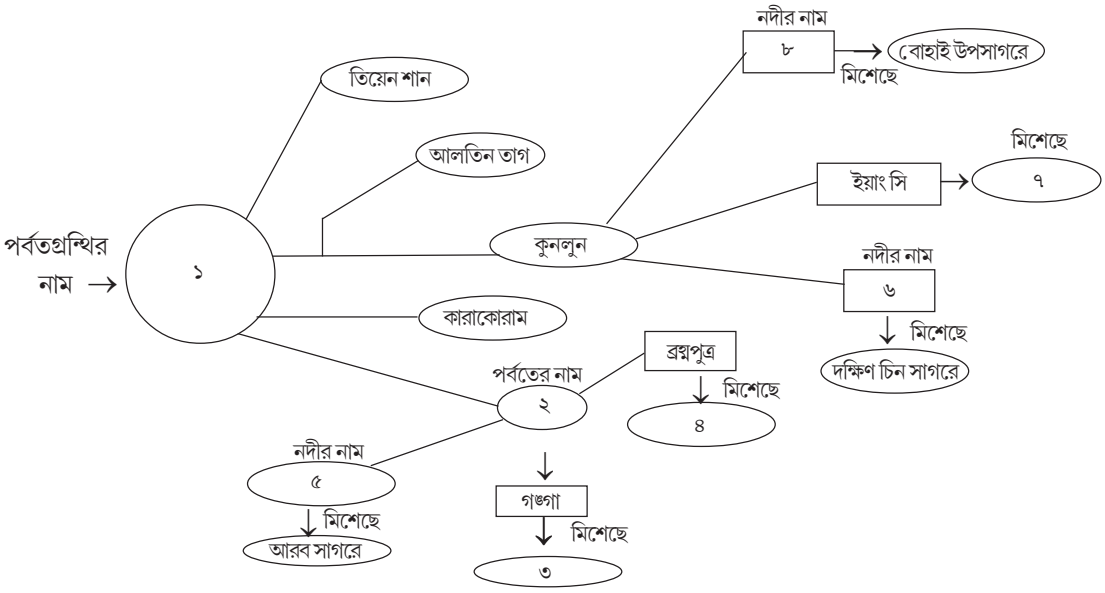

- ছকে প্রদত্ত প্রতেকটিই নদীই নিত্যবহ কেন?
- এই নদীগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম কেন?

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ

তোমরা জানো তো বৈচিত্র্যপূর্ণ জলবায়ুর কারণে এই এশিয়া মহাদেশেই পৃথিবীর অত্যন্ত উষ্ণ স্থান (কুয়েতের নুয়াইসিব), অত্যন্ত শীতল স্থান (সাইবেরিয়ার ঐমিয়াকন ও ভারখয়ানস্ক), পৃথিবীর আর্দ্রতম স্থান (ভারতের মৌসিনরাম), অত্যন্ত শুস্ক স্থান (আরব মরু অঞ্চল) সবকিছুই অবস্থিত।

আসলে মহাদেশটির উত্তরে হিমমণ্ডল থেকে দক্ষিণে নিরক্ষীয় অঞ্চল, পূর্বে মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে পশ্চিমের মহাদেশীয় অঞ্চল পর্যন্ত দীর্ঘ বিস্তৃতির কারণে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধরনের জলবায়ুই এখানে পরিলক্ষিত হয়।

তাই এশিয়া মহাদেশের জলবায়ুর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম, বিকাশ, বিস্তার উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই বৈচিত্র্যের মূল কারণগুলি হলো —

- **অক্ষাংশগত অবস্থান-** নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে জন্মায় চিরহরিৎ উদ্ভিদ। আবার উচ্চ অক্ষাংশের শীতল শুষ্ক জলবায়ুতে দেখা যায় চিরহরিৎ সরলবর্গীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য।

- **সমুদ্র থেকে উচ্চতা-** সমুদ্র উপকূলের সমপ্রায়ভূমিতে পর্ণমোচী, ম্যানগ্রোভসহ নানা উদ্ভিদ জন্মালেও, উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে শীতলতার কারণে সরলবর্গীয় উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়।

- **সমুদ্র থেকে দূরত্ব-** আমরা জানি সমুদ্র উপকূলের সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে হর্টিকালচার প্রাধান্য পায়। আবার সমুদ্র থেকে দূরের চরমভাবাপন্ন জলবায়ু যদি মরু অঞ্চল সৃষ্টি করে তখন, সেখানে কিন্তু কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য দেখা যাবে।

এছাড়াও সূর্যরশ্মির পতনকোণ, পাহাড়ের ঢাল, বৃষ্টিপাতের বণ্টন ও পরিমাণ, দিনের দৈর্ঘ্য, দৈনিক ও বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর, তুষারপাত, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকার চরিত্র এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বণ্টনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

একনজরে এশিয়ার জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ

(১) নিরক্ষীয় জলবায়ু- এই জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির। তাই এখানে চিরহরিৎ বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন — মেহগনি, রোজউড প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

(২) মৌসুমি জলবায়ু- এই জলবায়ুর গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল শীতল ও শুষ্ক। ঋতুভেদের জন্য এখানে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী উভয় ধরনের গাছ জন্মায়। যেমন — আম,জাম, শাল, সেগুন প্রভৃতি গাছ।

(৩) চিনদেশীয় জলবায়ু- উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শীতল ও শুষ্ক প্রকৃতির শীতকাল। এই ধরনের জলবায়ুতে প্রধানত চিরহরিৎ (চেষ্টনাট, ওক), পর্ণমোচী (বিচ, পাম, লরেল) প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু- এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো উষ্ণ-শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও শীতল-আর্দ্র শীতকাল। এতে মূলত ফল, ফুল, শাক-সবজি, কর্ক, অলিভ, লরেল, ল্যাভেন্ডার প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

(৫) উষ্ণ মরু জলবায়ু- প্রায় বৃষ্টিহীন উষ্ণ-শুষ্ক জলবায়ুতে মূলত বাষ্পীয় প্রস্বেদন প্রতিরোধী কাঁটা জাতীয় জাঙ্গল উদ্ভিদ (যাদের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে) ভালো জন্মায়। যেমন — বাবলা, ফণিমনসা, খেজুর প্রভৃতি গাছ।

(৬) সাইবেরীয় জলবায়ু- সুদীর্ঘ শীতকাল ও শীতল গ্রীষ্মকাল এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। সরলবর্গীয় তৈগা বনভূমিতে ঠান্ডা সহ্যকারী পাইন, ফার, স্প্রুস প্রভৃতি সূঁচালো পাতাযুক্ত শঙ্কু আকৃতির উদ্ভিদ জন্মায়।

(৭) তুন্দ্রা জলবায়ু- তুন্দ্রা অঞ্চলের হিমশীতল জলবায়ুতে প্রবল তুষারপাত ঘটে। অতিরিক্ত শৈত্যে শুধুমাত্র কিছু মস, লাইকেন ও শৈবাল জন্মায়।

✸ **এশিয়ার মানচিত্রে তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল, উষ্ণ মরু জলবায়ু অঞ্চল ও ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত করো। দলগতভাবে আলোচনা করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।**

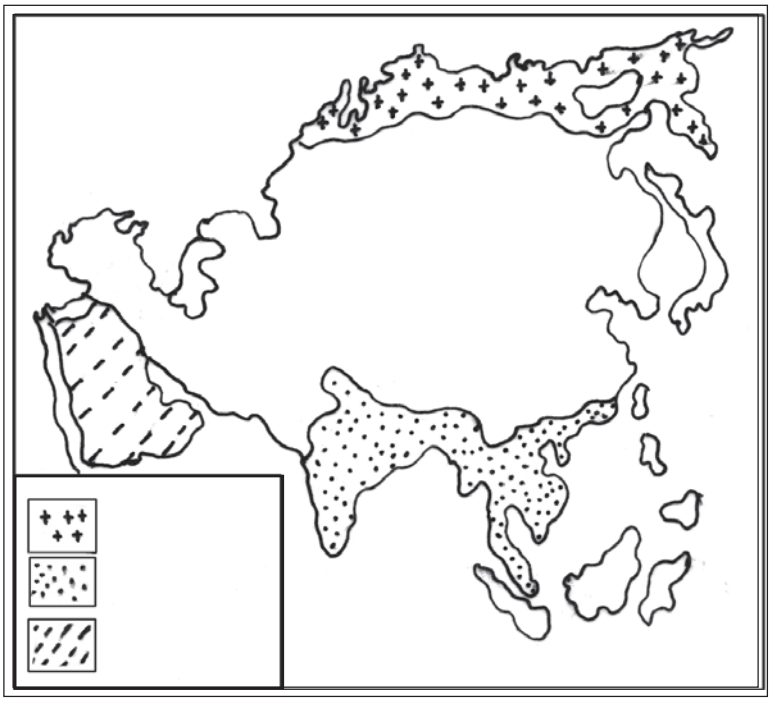

- উপরের তিনটি জলবায়ুর অন্তর্গত একটি করে দেশের নাম লেখো।
- তিনটি জলবায়ু অঞ্চলের একটি করে বৈশিষ্ট্য লেখো।

- প্রতিটি জলবায়ু অঞ্চলে কী ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখা যায় এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ শ্রেণির একটি করে বৃক্ষের উদাহরণ দাও।
- তুমি যে জলবায়ু অঞ্চলে বসবাস করো তার নাম লেখো।

মনে রাখা জরুরি :

- **পীত নদী** — চিন দেশের হোয়াংহো নদীটি হলুদ রঙের পলিযুক্ত জল বহন করে বলে একে পীত নদী বলে।
- **দ্বীপপুঞ্জ** — অনেকগুলো দ্বীপ যখন পাশাপাশি অবস্থান করে।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির 'এশিয়া মহাদেশ' অধ্যায়ে কতকগুলি বিশেষ অঞ্চল যেমন — চিনের ইয়াংসি নদী অববাহিকা, জাপানের টোকিও-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার তৈল বলয় অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ এশিয়া মহাদেশের একটি উত্তরবাহিনী নদী হলো —

(ক) গঙ্গানদী (খ) নর্মদা নদী (গ) লেনা নদী (ঘ) মেনাম নদী।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ এশিয়ার একটি প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতা হলো _____ সভ্যতা।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.১.২ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ ''শিল্ড অঞ্চল'' বলতে কী বোঝো?

৩. নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ অন্তর্বাহিনী নদী কাকে বলে?

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ এশিয়ার উত্তরবাহিনী ও দক্ষিণবাহিনী নদীর মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

৫. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৫.১ 'জলবায়ু দ্বারা স্বাভাবিক উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান নিয়ন্ত্রিত হয়' — এশিয়া মহাদেশের উদাহরণ সহযোগে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৬. নীচের রেখামানচিত্রে ইয়াংসি নদী, ইয়েনিসি নদী, পামীর গ্রন্থি, হিন্দুকুশ পর্বত, আরব মালভূমি, উত্তরের সমভূমি অঞ্চল, কাস্পিয়ান সাগর, বৈকাল হ্রদ, গোবি মরুভূমি উপযুক্ত প্রতীকসহ চিহ্নিত করো।

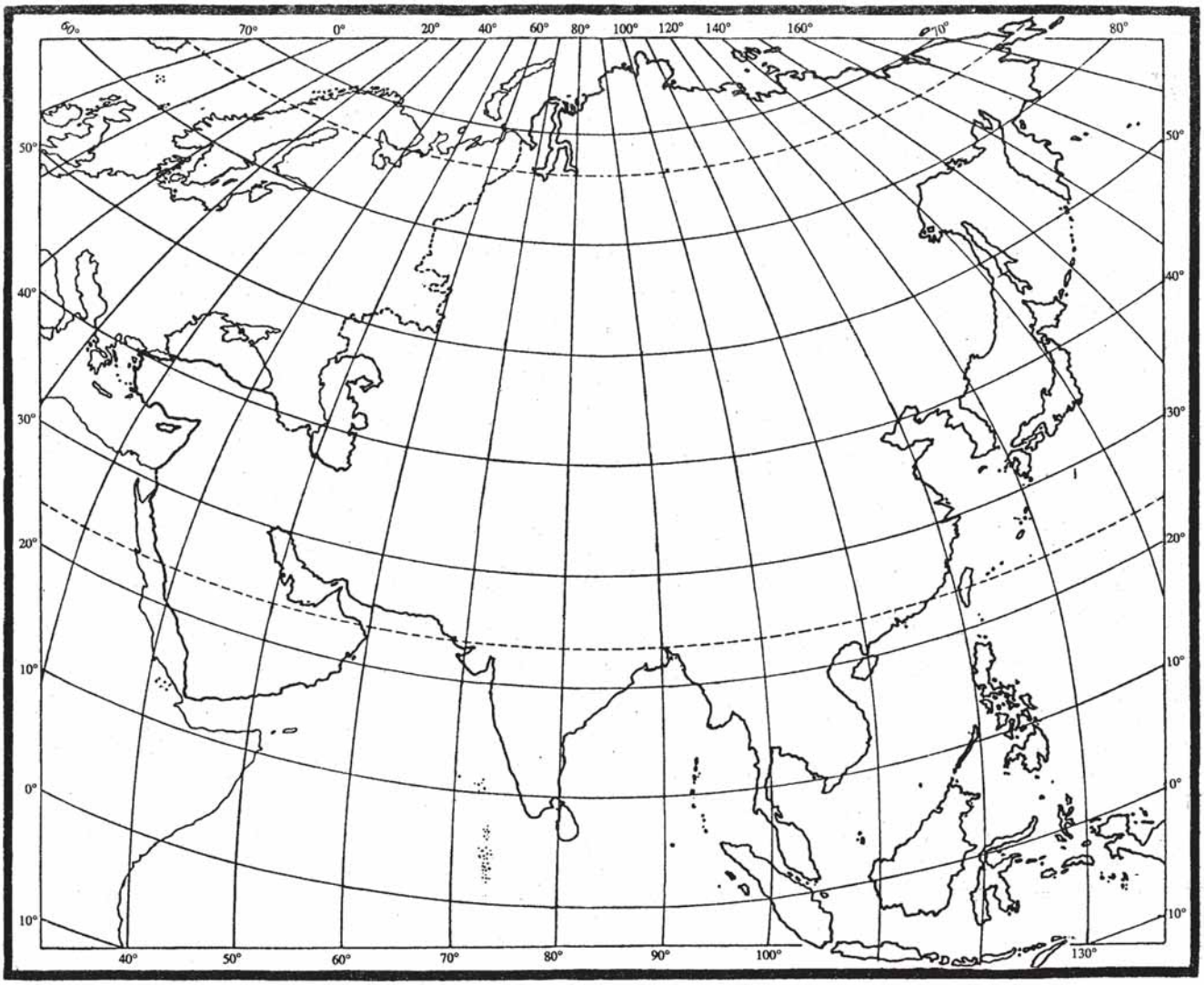

৪ আফ্রিকা মহাদেশের সাধারণ পরিচিতি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- আফ্রিকা মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিস্তৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- আফ্রিকা মহাদেশের ভূমিরূপগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- আফ্রিকার বিভিন্ন নদনদী সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- আফ্রিকা মহাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পৃথিবীর সর্বত্র জল, বায়ু, মৃত্তিকা, সূর্যালোক আমাদের বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। তবুও পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে স্থান-কাল-ভেদে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি কিছুটা আলাদা ধরনের। তাই পৃথিবীর অধিবাসী হিসেবে এখন আমরা জেনে নেবো আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে।

সাহারা মরুভূমি

মাসাইমারা

তোমরা নিশ্চয়ই অ্যাডভেঞ্চার ও কল্পকাহিনি ভালোবাসো। তাহলে বলতো পাহাড়-পর্বতের দুর্গমতা, সুবিশাল সাহারা মরুভূমির ভয়াবহতা, গভীর জঙ্গল ও হিংস্র জন্তুতে ভরা কোন মহাদেশ আজও তোমাদের ভাবনায় বিশেষ জায়গা করে নেয়? যে মহাদেশ মাসাইমারা সাভানা অঞ্চল, মিশরের পিরামিড, কঙ্গো-জাইরে নদীর আদিবাসী সম্প্রদায়, নীলনদের উপস্থিতির বিশেষত্ব জানান দেয়, তার নাম নিশ্চয়ই মনে এসে গেছে। ক্ষেত্রফল ও জনসংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহত্তম, যা আগে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ নামে পরিচিত ছিল, বন্যপ্রাণীর সেই মহাদেশটির নাম **আফ্রিকা**।

ভৌগোলিক অবস্থান ⇨ আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বে লোহিতসাগর ও ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর আফ্রিকাকে ঘিরে রাখে।

দ্রাঘিমাগত অবস্থান ⇨ পূর্বে ৫১°২৪′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১৭°৩৩′ পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

অক্ষাংশগত অবস্থান ⇨ উত্তরে ৩৭°২০′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ৩৪°৫২′ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পৃথিবীর প্রধান চারটি দিক, সময় ও অবস্থান নির্দেশক রেখা কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৩০′ উঃ), মকরক্রান্তি রেখা (২৩°৩০′ দঃ), নিরক্ষরেখা (০°) ও মূলমধ্যরেখা (০°) আফ্রিকা মহাদেশের ওপর দিয়ে প্রসারিত।

- পৃথিবীর একমাত্র আফ্রিকা মহাদেশেই স্পষ্টভাবে দুরকম বিপরীত ঋতু বিরাজ করে। আফ্রিকার উত্তরে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণে তখন শীতকাল বিরাজ করে।
- আফ্রিকাতে রয়েছে ৫৬টি দেশ। বিখ্যাত কয়েকটি শহর হলো কায়রো, খার্তুম, কেপটাউন ইত্যাদি।

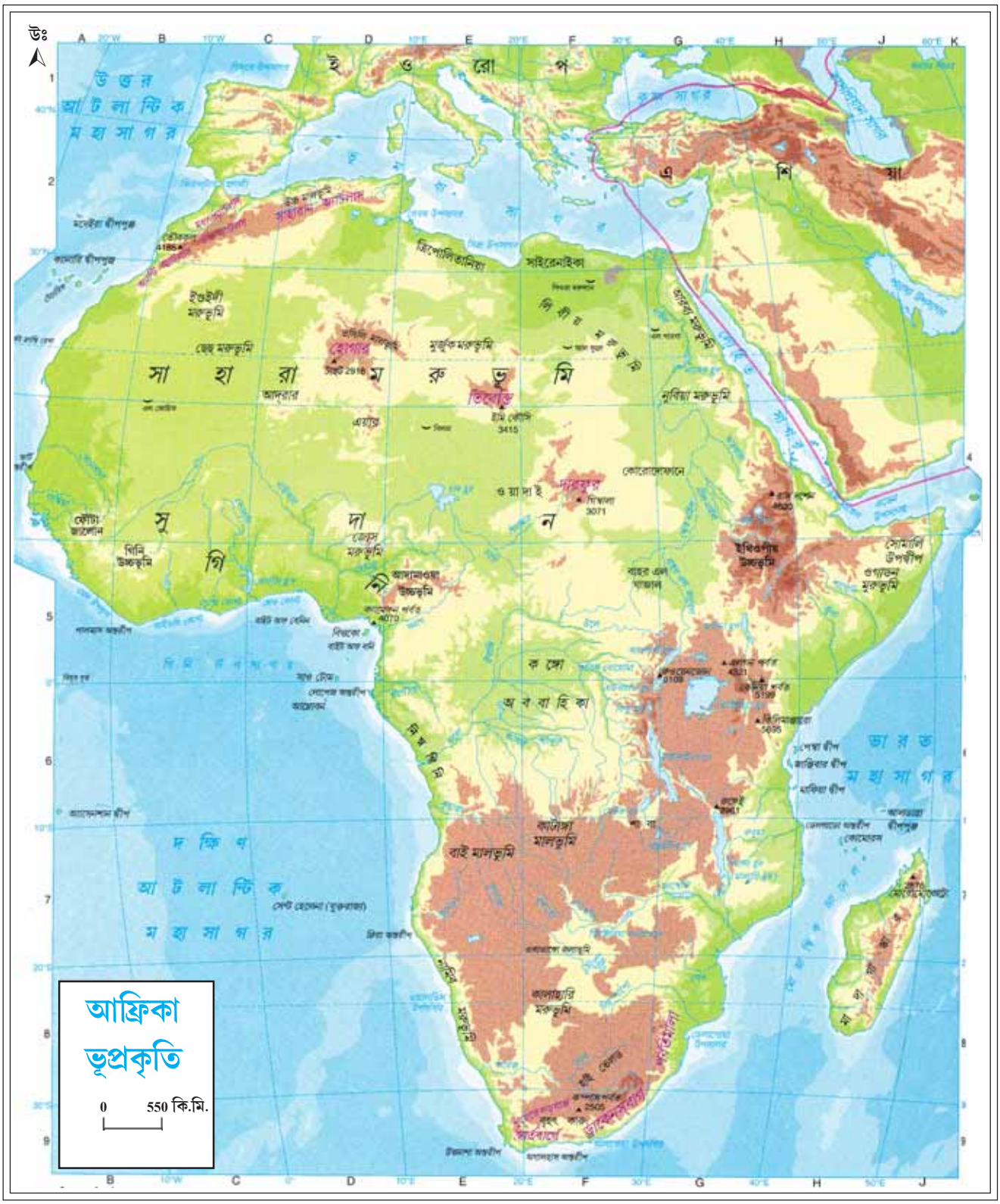
উঃ
আফ্রিকা
ভূপ্রকৃতি
0 550 কি.মি.

আফ্রিকা মহাদেশে গেলে যে যে ভূপ্রাকৃতিক বিশেষত্ব দেখা যাবে, চলো তা একনজরে দেখে নিই—

ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

ভূভাগ	প্রধান ভূমিরূপ	বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য, যা দেখা যাবে
উত্তরভাগ	সাহারা মরুভূমি	➢ পৃথিবার বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি। ➢ অত্যন্ত উষ্ণ, শুষ্ক ও রুক্ষ প্রকৃতির শিলাময় মরুভূমি। ➢ প্রায় জনবসতিহীন ও প্রায় উদ্ভিদশূন্য স্থান। ➢ সাহারার মধ্যভাগে রয়েছে আহাগ্গর ও টিবেস্টি পর্বত। ➢ ক্যাকটাস, মরুদ্যান ও উটের সাথে যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষ।
	উত্তর-পশ্চিমে আটলাস পর্বতমালা	➢ এর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হল— মাউন্ট তৌবকল (৪১৬৫ মিটার)।
দক্ষিণভাগ	কালাহারি মরুভূমি	➢ দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত। ➢ বালুকাময় প্রকৃতির।
	ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালা	➢ আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।
	হাই-ভেল্ড মালভূমি	➢ বিখ্যাত ভেল্ড তৃণভূমি।
পূর্বভাগ	নীলনদ অববাহিকা	➢ মরুকরণের হাত থেকে মিশরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ➢ কৃষি, শিল্প, বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, ঘন জনবসতি দেখা যায়।
	গ্রস্ত উপত্যকা ও হ্রদ	➢ ভূআলোড়নের ফলে বসে যাওয়া গভীর খাত অংশে টাঙ্গানিকা, মালাউয়ি, অ্যালবার্ট প্রভৃতি হ্রদ দেখা যায়।
	পূর্বপ্রান্তের উচ্চভূমি	➢ মাউন্ট কেনিয়া, মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো ও রুয়েঞ্জি পর্বত। ➢ **মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো** (৫৮৯৫ মি) আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। নিরক্ষরেখার কাছে থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত উচ্চতার কারণে এই পর্বতের চূড়া সারাবছর বরফাবৃত থাকে।
পশ্চিমভাগ	উত্তরে উচ্চভূমি দক্ষিণে মরুভূমি	➢ গিনি, আদামাওয়া উচ্চভূমি। ➢ বাই মালভূমি ও নামিব মরুভূমি।
মধ্যভাগ	কঙ্গো ও জাইরে নদী অববাহিকা	➢ দুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গল দ্বারা আবৃত। ➢ আদিবাসী মানুষরা (কঙ্গো, পিগমী, বান্টু) বাস করেন।

➢ **তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো যে মিশরকে নীলনদের দান বলে।**

আসলে সাহারা মরুভূমির করাল গ্রাসের হাত থেকে আফ্রিকার বাকী ভূভাগকে সিক্ত, সুজলা-সুফলা করে রাখার ক্ষেত্রে শুধু নীলনদ নয় আফ্রিকার অন্যান্য নদীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা নীচের ছকে দেখানো হলো —

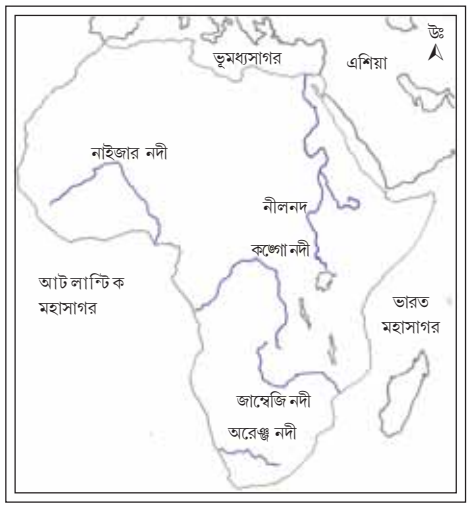

আফ্রিকার প্রধান নদীর বৈশিষ্ট্য

নদীর নাম	উৎস	প্রবাহের দিক	মোহনা	উপনদী ও শাখানদী	অববাহিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য
নীলনদ	বুরুন্ডির উচ্চভূমি	উত্তরবাহিনী	ভূমধ্যসাগর	সোবাট, ব্লু-নীল আটবারা, রোসেটা প্রভৃতি	➢ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী (৬৬৫০কিমি)। ➢ মোহনাতে বিশাল ব-দ্বীপ দেখা যায়। ➢ খার্তুম, আসোয়ান, কায়রোর মতো শহর গড়ে উঠেছে।
নাইজার নদী	সিয়েরা লিওন ও গিনি সীমান্তের ফুটজালোন	পূর্ববাহিনী	গিনি উপসাগর	বেনু, কাদুনা সোকোতো প্রভৃতি	➢ পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান নদী। ➢ নদী, বদ্বীপের জলাভূমি পরিযায়ী পাখির আস্তানা। ➢ 'তেলের নদী' নামে পরিচিত।
জাম্বেজি নদী	অ্যাঙ্গোলা মালভূমি	পূর্ববাহিনী	মোজাম্বিক প্রণালী (ভারত মহাসাগর)	কুয়ান্ডো, লুয়াগা, ডসুই প্রভৃতি	➢ আফ্রিকার চতুর্থ দীর্ঘতম নদী। ➢ এই নদীর গতিপথে বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত অবস্থিত।
কঙ্গো নদী (বর্তমানে জাইরে নামেও পরিচিত)	জাম্বিয়ার উত্তরপ্রান্তের টাঙ্গানিকা হ্রদের কাটাঙ্গা মালভূমি	পশ্চিমবাহিনী	আটলান্টিক মহাসাগর	কাওয়া, উবাঙ্গি সঙ্গা, কাসাই প্রভৃতি	➢ আফ্রিকার সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল এলাকা থেকে সৃষ্টি হওয়ায় এর জলের পরিমাণ বেশি। ➢ প্রবাহপথে বহু গভীর উপত্যকা দেখা যায়।
অরেঞ্জ নদী	ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত	পশ্চিমবাহিনী	আটলান্টিক মহাসাগর	ভাল, ইটস্	➢ ভেল্ড তৃণভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ➢ জলসেচের জন্য ২৯টি জলাধার তৈরি করা হয়েছে এই নদীতে। ➢ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে।

আফ্রিকার জলবায়ু

তোমরা জানো কোনো স্থানের স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ সেখানকার মৃত্তিকা ও জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা এখন স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রকগুলি সম্পর্কে জানবো।

নিয়ন্ত্রক	জলবায়ুর উপর প্রভাব
অক্ষাংশগত অবস্থান ও সূর্যের পতন কোণ	(i) নিরক্ষরেখা সংলগ্ন অঞ্চলে সূর্যের লম্ব কিরণে অধিক উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায়। (i) নিরক্ষরেখা থেকে যত মেরুর দিকে যাওয়া যায়, সূর্যের তির্যকরশ্মির কারণে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত কমতে থাকে। (i) তাই আফ্রিকার মধ্যভাগে উষ্ণ-আর্দ্র নিরক্ষীয় জলবায়ু, কর্কট ও মকরক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ ও শুষ্ক মরু জলবায়ু এবং আরও উত্তর ও দক্ষিণ অংশে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু দেখা যায়।
সমুদ্র থেকে দূরত্ব	সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমভাবাপন্ন ও সমুদ্র দূরবর্তী অঞ্চলে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়।
সমুদ্রস্রোত	বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর আবর্তনের কারণে সমুদ্রের উষ্ণ ও শীতল জলরাশি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সমুদ্রস্রোত রূপে প্রবাহিত হয়। তাই আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল বেঙ্গুয়েলা শীতলস্রোতের প্রভাবে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক প্রকৃতির। পূর্ব উপকূল উষ্ণ প্রকৃতির।
উচ্চতা	বায়ুর উষ্ণতা প্রতি কিমিতে ৬.৫° সেলসিয়াস হারে কমে, তাই উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু লক্ষ করা যায়।

উপরোক্ত চারটি মূল নিয়ন্ত্রক ছাড়াও পর্বতের অবস্থান, পাহাড়ি ঢাল, মৃত্তিকার প্রকৃতি, উদ্ভিদের অবস্থান, মানুষের কার্যকলাপ প্রভৃতিও জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

★ **নীচের সারণির শূন্যস্থানগুলিতে আফ্রিকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করো।**

বৈচিত্র্যের কারণ (১)	জলবায়ুর নাম (২)	জলবায়ুর উপর (১) এর প্রভাব	স্বাভাবিক উদ্ভিদের নাম	স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতির উপর (২) এর প্রভাব
অক্ষরেখা	নিরক্ষীয়			
সমুদ্র থেকে দূরত্ব		বৃষ্টি কম, চরমভাবাপন্ন		বড় ঘাস জাতীয় গাছ
সমুদ্র স্রোত	উষ্ণ মরু			জলের অভাবে কাঁটার আধিক্য
	পার্বত্য	৬.৫° সে/১কিমি তে হ্রাস	পাইন	

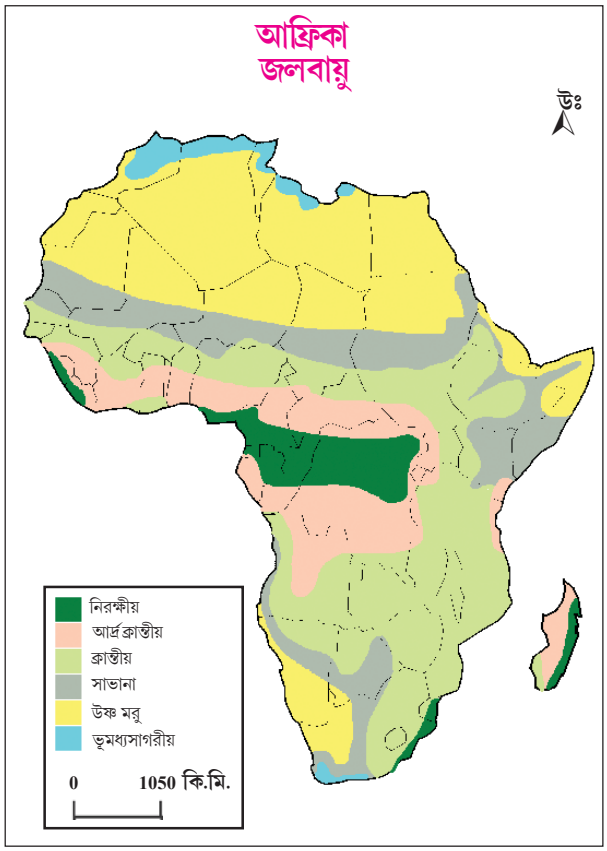

আফ্রিকা
জলবায়ু
উঃ
নিরক্ষীয়
আর্দ্র ক্রান্তীয়
ক্রান্তীয়
সাভানা
উষ্ণ মরু
ভূমধ্যসাগরীয়
0
1050 কি.মি.

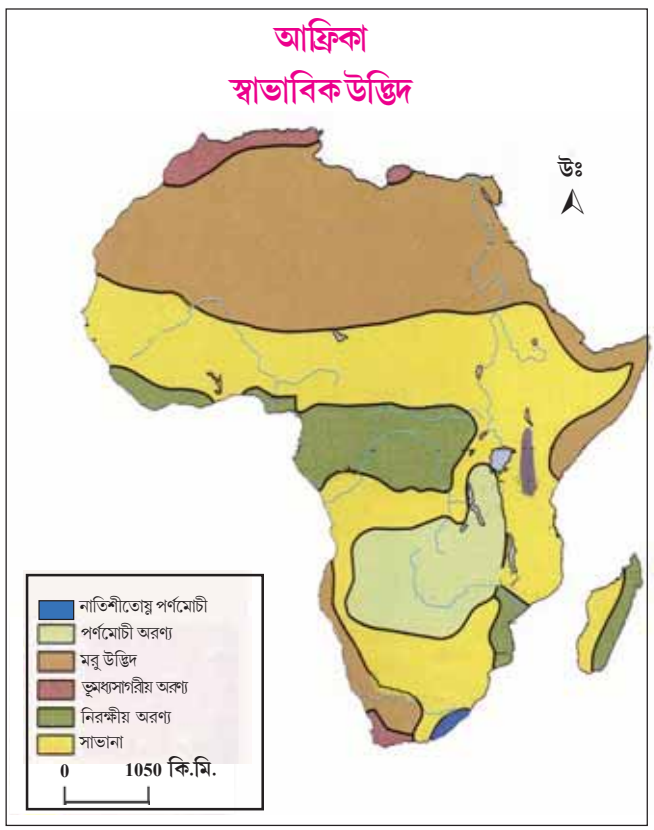

আফ্রিকা
স্বাভাবিক উদ্ভিদ
উঃ
নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী
পর্ণমোচী অরণ্য
মরু উদ্ভিদ
ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য
নিরক্ষীয় অরণ্য
সাভানা
0
1050 কি.মি.

আফ্রিকার মতো সুবিস্তৃত মহাদেশের জলবায়ুগত ভিন্নতা স্বাভাবিক উদ্ভিদের বন্টন ও বৈশিষ্ট্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, যা আমরা নীচে ছকের মাধ্যমে জেনে নেবো—

জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক

উদ্ভিদ অঞ্চল	অবস্থান ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদের নাম ও বৈশিষ্ট্য
নিরক্ষীয় চিরহরিৎ অরণ্য	নিরক্ষরেখার কাছাকাছি গড় উষ্ণতা সারাবছর বেশি থাকে (২৭° সেলসিয়াস)। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২০০-২৫০ সেমি। স্যাঁতস্যাঁতে ভ্যাপসা জলবায়ু। প্রখর সূর্যালোক, প্রচুর পরিচলন বৃষ্টি প্রচণ্ড উষ্ণতা লক্ষনীয়, ঋতুভেদ নেই।	প্রধান উদ্ভিদগুলি হলো — মেহগনি, রোজউড, আয়রনউড প্রভৃতি। চিরসবুজ, শক্ত কাঠের ঘন ও লম্বা বনভূমি দেখা যায়।
সাভানা তৃণভূমি	নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণে দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল, উষ্ণতা বেশী থাকে। বৃষ্টিপাত বছরে ১৫০ সেমি থেকে কমতে কমতে কোথাও কোথাও ২৫ সেমিতে নেমে আসে। অর্থাৎ স্বল্প বৃষ্টিপাত।	অ্যাকাসিয়া ও বাওবাব, পাম জাতীয় গাছ মাঝে মাঝে থাকলেও মূলত দীর্ঘ ঘাস ও জমির প্রান্তর দেখা যায়।
ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদ	আফ্রিকার একেবারে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে শুষ্ক গ্রীষ্ম ও আর্দ্র শীত জলবায়ু লক্ষ্য করা যায় (পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টি হয়।)	জলপাই, ওক, আখরোট, কর্ক প্রভৃতি গাছ জন্মায়। ফল, ফুল ও শাকসবজির জন্য (হর্টিকালচার) বিখ্যাত।
উষ্ণ মরু উদ্ভিদ	প্রায় বৃষ্টিহীন সাহারা, কালাহারি ও নামিব মরু অঞ্চলে দিনে উচ্চ তাপমাত্রা, রাত্রে নিম্ন তাপমাত্রা লক্ষ্য করা যায়। বৃষ্টিপাত বছরে ১৫ সেমি-এরও কম।	ক্যাকটাস জাতীয়, কাঁটা জাতীয় গাছ ও ঝোপঝাড়, ঘাস দেখা যায়। বাষ্পমোচনরোধে পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়ে গাছগুলির দেহে জল ধরে রাখার ক্ষমতা বজায় রাখে।। দীর্ঘ শিকড় ও পুরু ছাল দেখা যায়।
নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বা ভেল্ড	আফ্রিকার দক্ষিণাংশ স্পষ্ট ঋতুভেদযুক্ত। এই অঞ্চলে বাৎসরিক উষ্ণতার পার্থক্য লক্ষণীয়। স্বল্প বৃষ্টিপাত ঘটতে দেখা যায়, জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির।	ছোটো খসখসে সবুজ ঘাস, হাতিঘাস, পপলার, উইলোগাছ প্রভৃতি উঁচু পাহাড়ি ঢালে দেখা যায়। এখানকার তৃণভূমি ভেল্ড নামে পরিচিত।
ক্রান্তীয় মৌসুমি পর্ণমোচী উদ্ভিদ	আফ্রিকার পূর্বদিকে ও মাদাগাস্কার দ্বীপে উষ্ণ আর্দ্র গ্রীষ্মকাল ও শীতল শুষ্ক শীতকাল দেখা যায়।	শাল ও বাঁশগাছের জঙ্গল। শীতকালে জলাভাব গাছগুলোর পাতা ঝরিয়ে দেয়।
পূর্ব উপকূলীয় নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী উদ্ভিদ	আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলে আর্দ্র বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মকাল দেখা যায়।	ওক গাছের প্রাধান্য দেখা যায়। পর্ণমোচী চরিত্রের উদ্ভিদ।

★ আফ্রিকা মহাদেশের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের আন্তঃসম্পর্ক সারণির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করো।

জলবায়ু অঞ্চল	উষ্ণতার প্রকৃতি	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	স্বাভাবিক উদ্ভিদ	স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতি
নিরক্ষীয়				
				• লম্বা ঘাস • অ্যাকাসিয়া ও বাওবাব
		• শীতকালীন বৃষ্টিপাত • ৫০-১০০ সেমি		
			নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি	

মনে রাখা জরুরি :

- **মরুদ্যান** — মরুভূমির মাঝে জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদ।
- **গ্রস্ত উপত্যকা** — ভূআলোড়নের ফলে দুটি ফাটলের মধ্যবর্তী অংশ গিয়ে সৃষ্ট উপত্যকা।

তোমরা এই বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির 'আফ্রিকা মহাদেশ' অধ্যায়ে নীলনদ অববাহিকা, সাহারা মরুভূমি অঞ্চল প্রভৃতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ কালাহারি মরুভূমি আফ্রিকা মহাদেশের যেদিকে অবস্থিত তা হলো —

(ক) পূর্বদিক (খ) পশ্চিমদিক (গ) উত্তরদিক (ঘ) দক্ষিণদিক।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

২.১.১ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীটির নাম হলো _____।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ সাহারা মরুভূমি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ আফ্রিকার একটি তৃণভূমির নাম লেখো।

৩. নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ সমুদ্র থেকে দূরত্ব কীভাবে জলবায়ুকে প্রভাবিত করে তা উল্লেখ করো।

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ আফ্রিকার উষ্ণ মরু অঞ্চলের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৫. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৫.১ উদাহরণ সহকারে আফ্রিকা মহাদেশের স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জলবায়ুর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

৬. আফ্রিকার প্রদত্ত মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট প্রতীকসহ চিহ্নিত করো।

নীল নদ, কঙ্গো নদী, আটলাস পর্বতমালা, সাহারা মরুভূমি, নিরক্ষীয় চিরসবুজ অরণ্য অঞ্চল, সাভানা তৃণভূমি, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তিরেখা।

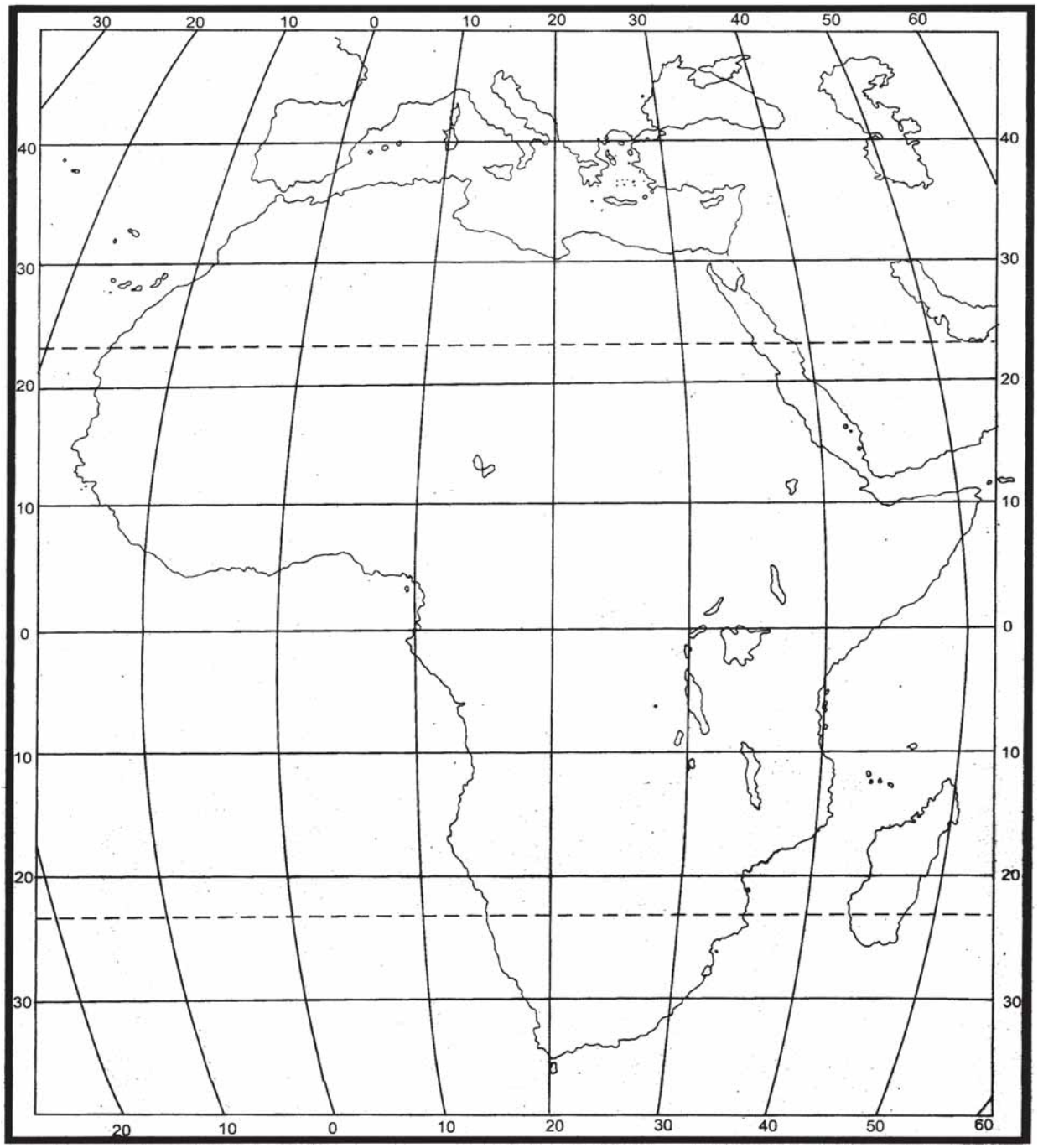

নমুনা প্রশ্নপত্র ৩

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ বিখ্যাত সুন্দরবন বদ্বীপটি নীচের যে নদী-জোড়টির মাঝে অবস্থিত তা হলো —

(ক) সিন্ধু-গঙ্গা (খ) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র (গ) নর্মদা-তাপি (ঘ) ইয়াং-সিকিয়াং।

১.২ এশিয়া মহাদেশের এই হ্রদটি আকার আয়তনে সাগরের ন্যায় সুবৃহৎ এবং স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত, হ্রদটির নাম হলো—

(ক) চিল্কা (খ) কাস্পিয়ান সাগর (গ) মরু সাগর (ঘ) বৈকাল।

১.৩ এশিয়ার অন্তর্গত ৪৮টি দেশের মধ্যে যে দেশটি নেই, তা হলো —

(ক) চিন (খ) অস্ট্রেলিয়া (গ) ভারত (ঘ) সৌদি আরব।

১.৪ নীচের নদীগুলির মধ্যে বিপরীত দিকে বয়ে যাওয়া নদীটিকে আলাদা করে নাও —

(ক) ওব (খ) ইনিসি (গ) ইরাবতী (ঘ) লেনা।

১.৫ গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যে খরস্রোতা নদীটির মোহনায় কোনো বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি সেটি হলো —

(ক) গঙ্গা (খ) গোদাবরী (গ) কাবেরী (ঘ) নর্মদা।

১.৬ নীচের যে জলবায়ুতে তীব্র জলাভাবে গাছগুলির শিকড় মাটির বহু গভীরে প্রসারিত, পাতাগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত, কাণ্ড জলধারণে সক্ষম হয় তা হলো —

(ক) তুন্দ্রা (খ) সাইবেরীয় (গ) উষ্ণমরু (ঘ) চিনদেশীয়।

১.৭ এশিয়ার সমুদ্র উপকূলে যদি একটি পর্বত থাকে, সেই পর্বতের নীচ থেকে ওপরে উঠলে যে গাছগুলি তুমি পরপর দেখবে তা হলো —

(ক) তুন্দ্রা — সরলবর্গীয় — পর্নমোচী — ম্যানগ্রোভ।

(খ) সরলবর্গীয় — ম্যানগ্রোভ — তুন্দ্রা — পর্নমোচী।

(গ) পর্নমোচী — সরলবর্গীয় — ম্যানগ্রোভ — তুন্দ্রা।

(ঘ) ম্যানগ্রোভ — পর্নমোচী — সরলবর্গীয় — তুন্দ্রা।

১.৮ আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণদিকে বালুকাময় মরুভূমিটি হলো —

(ক) সাহারা (খ) থর (গ) কালাহারি (ঘ) গোবি।

১.৯ সাহারা মরুভূমির মরুকরণের হাত থেকে মিশরকে রক্ষা করে সুজলা সুফলা করে রেখেছে যে নদীর অববাহিকা তা হলো—

(ক) নীলনদ (খ) কঙ্গো (গ) অরেঞ্জ (ঘ) নাইজার।

১.১০ পৃথিবীর একমাত্র মহাদেশ যেখানে বছরের একই সময় দুটি ভিন্নধর্মী ঋতু লক্ষ করা যায় —

(ক) এশিয়া (খ) ইউরোপ (গ) আফ্রিকা (ঘ) ইউরোপ।

১.১১ নীচের যে বিকল্পটি আফ্রিকাকে অন্য মহাদেশ থেকে আলাদা করে রেখেছে তা হলো —

(ক) আদিবাসী — পিরামিড — সাহারা মরুভূমি — নীলনদ।

(খ) এভারেস্ট — গঙ্গা — তৈগা বনভূমি — পামীর মালভূমি।

(গ) আদিবাসী — হিমালয় — মরুসাগর — সিন্ধুসভ্যতা।

(ঘ) আদিবাসী — সেলভা অরণ্য — আমাজন — আন্দিজ।

১.১২ আফ্রিকা মহাদেশের যে বিখ্যাত তৃণভূমিটির ছোট ও দীর্ঘ ঘাসের মাঝে মাঝে অ্যাকাসিয়া ও বাওবাব বৃক্ষ দেখা যায় তা হলো—

(ক) পম্পাস (খ) সাভানা (গ) ভেল্ড (ঘ) প্রেইরি তৃনভূমি।

১.১৩ এশিয়া ও আফ্রিকার দক্ষিণ দিক ছুঁয়ে প্রসারিত জলভাগটি হলো —

(ক) আটলান্টিক মহাসাগর (খ) ভারত মহাসাগর (গ) প্রশান্ত মহাসাগর (ঘ) কুমেরু মহাসাগর।

১.১৪ নীচের যে নদীটি আফ্রিকা মহাদেশের মাঝ বরাবর থাকা নিরক্ষরেখাকে দুবার ছেদ করেছে যার বর্তমান নাম — জাইরে নদী—

(ক) নাইজার (খ) কঙ্গো (গ) জাম্বেজি (ঘ) নীলনদ।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ এশিয়ার উত্তরে শঙ্কু আকৃতির গাছে ভরা পৃথিবীর বৃহত্তম সরলবর্গীয় অরণ্য _____ বনভূমি নামেও পরিচিত।

২.১.২ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে রয়েছে কর্কটক্রান্তি রেখা, মধ্যভাগে নিরক্ষরেখা একইভাবে আফ্রিকার দক্ষিণে রয়েছে ২৩° দক্ষিণ অক্ষরেখা যা _____ রেখা নামে পরিচিত।

২.১.৩ এশিয়ার দক্ষিণাংশের বিখ্যাত এই নদী জোড়াটি মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়নি যার নাম ইউফ্রেটিস — _____ ।

২.১.৪ আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে থাকা আটলাস পর্বতমালার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হলো _____ যার উচ্চতা ৪১৬৫ মিটার।

২.১.৫ _____ নদীর অপর নাম স্বর্নরেণুর নদী।

২.২ **বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :**

২.১.১ আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গটি হলো মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো।

২.২.২ অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে তুন্দ্রা অঞ্চলে মস, লাইকেন জন্মায়।

২.২.৩ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থান করা সত্ত্বেও মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর উপরিভাগ সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে।

২.২.৪ ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে অরেঞ্জ নদীটি ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে।

২.২.৫ তুরানের নিম্নভূমি দক্ষিণের প্রাচীন মালভূমির অংশ।

২.৩ **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ বরফ অঞ্চলের নদী 'লেনা' হলো	১. ভূমধ্যসাগরীয়
২.৩.২ সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়	২. চরমভাবাপন্ন জলবায়ু
২.৩.৩ যে জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয়	৩. ভেল্ড অঞ্চল
২.৩.৪ শক্তশিলা দ্বারা গঠিত হয়	৪. উত্তরবাহিনী
২.৩.৫ সমুদ্র থেকে দূরে দেখা যায়	৫. মৌসিনরামে
২.৩.৬ নাতিশীতোষ্ণ তৃনভূমি হলো	৬. শিল্ড অঞ্চল

২.৪ **একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :**

২.৪.১ নিরক্ষীয় জলবায়ুতে জন্মায় এমন দুটি চিরহরিৎ উদ্ভিদের নাম লেখো।

২.৪.২ পৃথিবীর জনবহুল দেশ এশিয়ায় পৃথিবীর কত শতাংশ মানুষ বসবাস করেন?

২.৪.৩ নর্মদা বাদে এশিয়ার একটি পশ্চিমবাহিনী নদীর নাম লেখো যা আরব সাগরে পতিত হয়েছে।

২.৪.৪ আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি পর্বতমালার নাম লেখো।

২.৪.৫ কোন সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু শীতল প্রকৃতির হয়?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ আফ্রিকার পূর্বদিকের গ্রস্ত উপত্যকা অঞ্চলের দুটি হ্রদের নাম লেখো।

৩.২ এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করে।

৩.৩ এশিয়া মহাদেশের দুটি প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার উদাহরণ দাও।

৩.৪ উদাহরণ সহযোগে পর্বতগ্রন্থি কাকে বলে লেখো।

৩.৫ এশিয়ার পীত নদী কাকে বলা হয় ও কেন?

৩.৬ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরের কোন জলবায়ুতে ফল-ফুল ও শাক-সবজি ভালো জন্মায়?

৩.৭ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোন মহাদেশের কোন নদীর গতিপথে সৃষ্টি হয়েছে?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ এশিয়া মহাদেশের পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

৪.২ নিরক্ষীয় জলবায়ু ও সাইবেরীয় জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

৪.৩ এশিয়ার মধ্যভাগে থাকা পার্বত্যভূমির তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪.৪ আফ্রিকা মহাদেশের সাভানা তৃণভূমি ও ভেল্ড তৃণভূমি অঞ্চলের মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

৪.৫ অক্ষাংশগত অবস্থান ও সূর্যালোকের পতন কোণ কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা আফ্রিকা মহাদেশের সাপেক্ষে আলোচনা করো।

৪.৬ আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যভাগ দুর্ভেদ্য অরণ্যে ঢাকা থাকার তিনটি কারণ লেখো।

৪.৭ নাইজার নদী অববাহিকার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ আফ্রিকা মহাদেশের জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রকগুলির প্রভাব সম্পর্কে যা জান লেখো।

৫.২ 'এশিয়ার-ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য' প্রসঙ্গে যেকোনো দুটি ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করো।

৫.৩ জনজীবনে এশিয়ার নদীগুলির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫.৫ আফ্রিকা মহাদেশের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৫.৬ 'চরম বৈচিত্র্যের মহাদেশ হলো এশিয়া' — ভৌগোলিক উদাহরণ সহযোগে বক্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৬. পৃথিবীর রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপযুক্ত প্রতীকের সাহায্যে চিহ্নিত করো ঃ

৬.১ আফ্রিকার উত্তরে থাকা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি।

৬.২ এশিয়া ও আফ্রিকাকে আলাদা করেছে যে সাগর।

৬.৩ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত কঙ্গো নদীর অববাহিকা।

৬.৪ আফ্রিকার মাঝ বরাবর বিস্তৃত অক্ষরেখা।

৬.৫ আরব মালভূমি অঞ্চল।

৬.৬ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল যা ভারতে অবস্থিত।

৬.৭ ওব-ইনিসি-লেনা গঠিত উত্তরের সমভূমি অঞ্চল।

৬.৮ এশিয়ার পূর্বে থাকা জাপানের দ্বীপপুঞ্জ।

৬.৯ এশিয়ার গভীরতম হ্রদ।

৬.১০ আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল।

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬